একটি সত্যের সন্ধানে ইবুক

সৌদি আরব শিরোচ্ছেদ ও অন্যান্য

জাহাঙ্গীর হোসেন

shottershondhane.com

ইবুক তৈরি শুভ্র ফয়সাল

সৌদি আরব শিরোচ্ছেদ ও অন্যান্য
জাহাঙ্গীর হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব
জাহাঙ্গীর হোসেন
(অনুমতি ব্যতিরেকে
এই বই এর কোন অংশের মুদ্রণ করা যাবে না: তবে ইবুকটি বন্টন করা যাবে, ধন্যবাদ)

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২১ ইংরেজি

ইবুক তৈরী
শুভ্র ফয়সাল

প্রচ্ছদ
শুভ্র ফয়সাল

সম্পাদনা
সত্যের সন্ধানে

প্রকাশক
সত্যের সন্ধানে

ইমেইল
info@shottershondhane.com
shuvro@shottershondhane.com

ওয়েব
www.shottershondhane.com
www.shottershondhane.org

মূল্য
ইবুকটি বিনামূল্যে
বন্টন করা যাবে

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

উৎসর্গ

আমার সেই স্ত্রী হাসনেয়ারা বুলুকে, যে আমার ক্যান্সার অপারেশনের সময় একটানা ১৮-রাত টাটা ক্যান্সার হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে নির্ঘুম কাটিয়েছিল, যমরাজ থেকে আমায় ছিনিয়ে আনতে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

প্রাক-কথন

কৈশোর থেকে একাল অবধি জীবনের প্রবাহমান ক্ষয়জাত নরম পলিমাটির মতো সারাক্ষণ গাঁয়ের মানুষের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি আমি! আমার ছিন্নপত্রের অলকানন্দা জীবনের ঝড়জলে ভেসে-ভেসে দোদুল্যমান তার ঋণাত্মক খ্যাপা-বুনো হাঁসের মতো উড়েছি ওদের সাথে এক মানবিক আকাশে অনেক দিন অনেক রাত! অতি সাধারণ দলিত মানুষের কষ্ট জীবনের হাত ধরে তাদের সাথে অনিদ্রার দেহাতি গান গেয়েছি সকাল থেকে সন্ধ্যা, রাত থেকে ভোর অবধি! আমার মা শিখিয়েছিলেন আমায়, এক সপ্তরঙা চতুর্বর্ণা হৃদয়ের রক্তলেখায় পলিময় চরে জেগে ওঠা জীবনের গান গাইতে। যে জীবন ঘষা আগুন রঙের দহে পুড়তে পুড়তে আমি চড়ে বেড়িয়েছি আমার দ্বীপ গাঁ থেকে বিশ্বচরাচর। আর জীবন সেলুলয়েডে ধারণ করেছি ঐসব মানুষের কর্ষিত জীবনজমির ফসল। যে জীবন দহনের রক্তবীজ পেয়েছি যেখানেই আমি, তাই তুলে এনেছি এখানে! এ বইয়ে আসলে ঐসব মানুষের স্বপ্নময় রাতঘুমের সুবর্ণরেখার জীবন চিত্রায়ণ তুলেধ রা হয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে গল্প, কাহিনী কিংবা হতে পারে ঐসব সপ্তপদী মানুষের জীবনপথের কাব্যগাথা। বৈশ্বিক সুখ আর কষ্টবাতাসে উড়ে উড়ে এসব মানবিক ফুলের নেকটার-কথন তুলে ধরেছি আমি শ্রমজীবী নপুংশক মৌমাছির মতো এ জীবনকাব্যকথায়। তাই এখানে যেমন দেখা মিলবে কৈশোরিক স্কুলবন্ধু, গাঁয়ের জেলে, কিষাণ, নদী, নৌকো, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসসহ প্রবাহমান মানুষের সুখ দুঃখগুলোকে। এ গল্পকাব্যের পাতায় পাতায় মিলবে দলিত মানুষের শোক-জীবনের বীজরক্তের দাহহীন তীব্রতায় জ্বলতে থাকা মানবিকতার দুঃখঋণে মরতে থাকা বোধের ঘ্রাণ। আমার জীবনপথের সপ্তরঙা কাহিনী বলতে গিয়ে সামনে চলে এসেছে মানুষ আর তার ধর্ম, হিন্দুত্ব আর মুসলমানিত্ব, ধার্মিকতাআর নির্ধার্মিকতার কথামালা। এ গ্রন্থে গ্রথিত সব জীবনকাব্যই আসলে মানুষের স্বপ্ন দ্বীপেরমা নবিক বোধের সুঁই সুতোয় গাঁথা এক ভালবাসার গল্প! বিশ্বচরাচরে চলার পথের অনাদিকালের হৃদয়ঘন উৎস মাঝে বর্ষা স্রোতে ভাসমান জেদি কচুরিপানার মতো ভেসে ভেসে এ জীবনকাব্য হৃদয়েধারণ করেছি আমি! মায়ের ভালবাসার স্বাপ্নিক উলের কাঁটায় স্বপ্নবোনা জীবন গহীনে, প্রান্তিক মানবিক বোধগুলোকে নিয়ে একাকি হেঁটে-হেঁটে এ কাহিনীকাব্যের ইট-পাথর, বাঁশ-খুঁটি সংগ্রহ করেছি একান্ত নিভৃতে। আলোকিত যৌক্তিক জীবনের অন্ধ সাগর জলের অমরাবতীর তীরে দাঁড়িয়ে গভীর রাতের একফালি বাঁকা চাঁদের ঘ্রাণতায় জীবনকে ঘষে দেখেছি আমি এ গল্পগুলোর মাঝে। পথকাঁটার নির্বাসনের সুখ আকাশে ভেসে ভেসে রহস্যঘেরা ধাঁধাঁময় জীবনপথের প্রশ্নগুলো ছেঁকে আনার চেষ্টা করেছি এ কাহিনীকাব্যে। এ জীবনের গল্পে ভালোবাসাময় জলের অতলে ডুবে হাকুল শপথের কলকল ধ্বনিকে তুচ্ছ করে হেঁটেছি সপ্তপদী পিচ্ছিল আর বন্ধুর পথে। বুকের ভেতরের সুপ্ত ক্ষয়িষ্ণু পাথরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে জেগে ওঠা নির্বাসিত দলিত বিবর্ণ ঘাস পাতাদের তুলে এনেছি আমার নানাবিধ গল্পের অনুসঙ্গ হিসেবে। আমার গল্পের চরিত্রগুলো এবং সম্ভবত আমি নিজেও মানুষের কষ্টবাতাসের একগুচ্ছ যন্ত্রণায় ভেসে গেছি পদ্মা-মেঘনার বেনোজলে প্রতিনিয়ত। তারপরো মানুষের ভালবাসার পিঠের শিরদাঁড়া ধরে জেগে থেকেছি আমি সারাদিন সারারাত প্রতিনিয়ত। ধর্ম বিধৌত প্রেত সময়ের হিংসা-নদীর বিষাক্ত কালো জলটলাতে পারেনি আমায় গাল্পিক সৎভাষণে একটুও। তাইতো বারবার জীবন সড়কের কত অজানা মানুষের চিরচেনা ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বালাতে চেষ্টা করেছি আমি এ গল্প গুলোর মাঝে প্রতি মুহূর্তে নানা প্রতিকুলতার মাঝেও! আমার জীবনের এক চিমটি রোদ, এক দৌঁড়ের ক্লান্তিকর দুপুর, একমুঠো শীতবিকেল, মেঘনার এক আঁজলা ঘোলাজল, একবোঝা সুখ-দুঃখ, একআকাশ রূপোলী চাঁদজোৎস্না, এক পশলা গুমোটমেঘ, এক দিঘী টলটলে সুখবাতাস, এক বৈশ্বিক সূর্যালোক, এক ধোঁয়াশাপূর্ণ নাক্ষত্রিক রাত,এক নদী কলকলে বুক-বাগানের ঝরনাজল, আর আমার মায়ের এক আঁচল ভালবাসায় স্নাত আমার এ জীবন পথের কাব্য গল্পমালা! যা তুলে দিলাম দুই বাংলার বাংলাভাষিক পাঠকদের হাতে।

জাহাঙ্গীর হোসেন
বারিধারা ঢাকা ২০২১
ইমেইল : jahangirhossaindhaka@gmail.com

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সৌদি আরব ও আমার "শিরোচ্ছেদ" কাহিনি

সুশিক্ষিত উচ্চাকাঙ্খী আমার মায়ের ইচ্ছে ছিল আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা এ জাতীয় উন্নত কেন দেশের নাগরিক হই আমি। কিন্তু বার বার ফিরে আসি তার আঁচলতলে আমি। আমার ইঞ্জিনিয়ার মেজোভাই ১৯৭৭-সন থেকেই জেদ্দার কিং আ: আজিজ ভার্সিটির "কুলিয়াতুল হান্দেসা" মানে ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কর্মরত ছিলেন। মা তাকে নির্দেশ দিলেন, "বাংলাদেশ থেকে যেহেতু কানাডার ভিসা পাওয়া বেশ জটিল। তাই আমাকে সৌদি নিয়ে, সেখান থেকে যেন কোন সৌদির মাধ্যমে কানাডা পাঠানো হয়"।

:

১৯৮৭ সনে ঢাকা ভার্সিটির বাংলার মাস্টার্স শেষপর্ব এবং ১৯৯০-সনে ঢাবির শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট থেকে "এমএড" পরীক্ষা দিয়েই আমি চলে যাই জেদ্দা। উদ্দেশ্য জেদ্দা থাকা নয়, সেখান থেকে কানাডা পাড়ি দেয়া। "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের" নামে এক ব্যবসায়ী সৌদির সাথে মেজোভাইর একটা চুক্তি হয়। ১০,০০০ রিয়ালের বিনিময়ে, সে তার সেক্রেটারী বানিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে কানাডা ও ওখানে ছেড়ে চলে আসবে সে। ১৯৯০-সনে জেদ্দা পৌঁছেই "কিউরিসিটি"-বসত একদিন জেদ্দার বাংলাদেশ দূতাবাসে যাই আমি। সেখানে গিয়ে দেখি, দূতাবাস পরিচালিত ঢাকা বোর্ড অন্তর্ভুক্ত বাংলাদাশ দূতাবাস স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে ও কলেজ শাখায় একজন করে "প্রভাষক" নেয়া হবে। জাস্ট ফান কিংবা "কি হয় দেখি" হিসেবে সেখানে "ইন্টারভিউ" দেই আমি। এবং আমাকে বাংলা "প্রভাষক" হিসেবে ঐ স্কুল কাম কলেজে নিয়োগ প্রদান করা হয়। শুনে ভাই বলেন, "কদিন ক্লাস কর এখানে, যতদিন ঐ সৌদি তোকে কানাডা নিয়ে না যায়"!

:

ব্যবসায়ী "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের" ছিল তায়েফের একজন গায়ক ও লোককবি। সাধারণত এ ধরণের কবিমনা লোকদের মন-মানসিকতা উদার হয়। তার ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা ছিল চীন ও তাইওয়ানের সাথে। "এলসি" খুলে সে প্রায় প্রতিমাসে কোটি টাকার মালামাল আমদানী করতো চীন-তাইওয়ান থেকে। কিন্তু সে ইংরেজি জানতোনা বা "এলসি খোলা" ইত্যাদি বুঝতোনা। একদিন আমাকে প্রস্তাব দিলো, আমি যদি তার সাথে নিয়মিত চীন-তাইওয়ান যাই ও তার ব্যবসার কাজে তাকে সহযোগিতা করি, তবে তিনি তার ব্যবসার লাভের অর্ধেক আমায় দেবেন। মানে পুঁজি তার, আর মেধা ও দাপ্তরিক কাজ আমার। দূতাবাস পরিচালিত কলেজে তখন মাত্র দুটো শাখা ছিল। একটা মেয়েদের, একটা ছেলেদের। তাতে দৈনিক মাত্র দুটো ক্লাস নিতে হতো আমার। মানে দুপুর ১-টার মধ্যেই আমি ফ্রি হয়ে যেতাম। কখনো সখ করে দশম শ্রেণিতেও ক্লাস নিতাম আমি বাংলার। কানাডা যাওয়ার প্লান বাদ দিয়ে "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের"এর সাথে বিকেলে তার অফিসে নিয়মিত বসতে থাকলাম। রোজার মাস এলে কলেজ বন্ধ হয়ে গেলো, দেড় মাসের জন্য। এই সময় সৌদি আল শায়েরের সাথে প্রোগ্রাম হলো চীন-তাইওয়ান যাবো আমরা দুজনে।

.

কিন্তু বাংলাদেশের পাসপোর্টে তখন লেখা থাকতো "ইসরাইল ও তাইওয়ান যাওয়া বারণ"। জেদ্দা তাইওয়ান এ্যামবেশী থেকে বাংলাদেশ পাসপোর্ট দেখেই তা ছুড়ে ফেলে দিলো দূতাবাস কাউন্টারের মহিলা। সৌদি আল শায়ের তা তার তাইপের ব্যবসায়িক পার্টনারকে জানালে, সে তাইপের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের "বিশেষ পার্মিশান" নিয়ে তা পাঠালো জেদ্দার তাইওয়ান দূতাবাসে। এবার চীন আর তাইওয়ান দুদেশের ভিসাই পেলাম আমি। ১৯৯১-সনে এই প্রথম আমার চীন তাইওয়ান যাওয়া। ব্যবসা বেশ জমে গেলো সৌদির সাথে। মাসে আমার ব্যবসায়িক আয় ৫/৬ লাখ টাকা, আর কলেজ থেকে বেতন ও বিভিন্ন দায়িত্বের ভাতাসহ সাকুল্যে পাই প্রায় লাখ খানেকের মত। কন্যা ছোট নাবিলাসহ তার মাকে নিয়ে যাই জেদ্দা। নাবিলাকে ভর্তি করাই আমাদেরই স্কুলে ক্লাস টু-তে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

দূতাবাস পরিচালিত স্কুল-কলেজের শিক্ষক হিসেবে জেদ্দা কমিউনিটির আওয়ামী পরিবারের লোকজনের সাথে খুব সখ্যতা গড়ে ওঠে আমার। ৩-টা আওয়ামী সংগঠন ছিল তখন জেদ্দা। কিং ফাহাদ হাসপাতালের ড. মতিউর রহমানের "(ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ, যাকে তারা আওয়ামীলীগ বলতো, ঘাটাইলের ৯ম সংসদের MP হয়ে মারা যান তিনি কবছর আগে), চট্টগ্রামের সোনা আলীর (বঙ্গবন্ধু পরিষদ) এবং কিং ফাহাদ হাসপাতালের ডা: আলমের (বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ)। ৩-জনেই তাদের দলে টানতে চাইতো আমায় আমার কর্মদক্ষতার কারণে। আমার অজান্তে বিভিন্ন পদে তাদের কমিটিতে তারা রেখে দিতো আমার নাম! তাদের "বার্ষিকী" ইত্যাদি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলাম বেশ কবার আমি। কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রায় ২৭-লাখ সৌদি প্রবাসীর যে সকল ছেলে-মেয়ে দূতাবাস স্কুল-কলেজে পড়তো, তাদের অধিকাংশ পরিবার ছিল জামাতি কিংবা জামাত-ঘেষা। এর মধ্যে আওয়ামী ৩-সংগঠনের পরামর্শে কলেজ কর্তৃপক্ষ, মানে দূতাবাস থেকে আমাকে দায়িত্ব প্রদান করে "কলেজ বার্ষিকী" প্রকাশনা ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক "আলোকচিত্র" ও "কুইজ প্রতিযোগিতা" আয়োজনের। একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও মুক্তচিন্তক মানুষ হিসেবে ক্লাসে অবলীলায় বাংলাদেশ, এর স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত-পাকিস্তানের ভূমিকা, ৭১-এ সোভিয়েত ভূমিকা, আমেরিকান ৭ম নৌবহর প্রেরণ, পাকিস্তানপন্থী বাংলাদেশী রাজাকার আলবদর আলসামস ইত্যাদি বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করি আমি ক্লাসে। এই প্রথম প্রকাশিত কলেজ বার্ষিকীতেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক নানাবিধ লেখা অন্তর্ভুক্ত করি। বঙ্গবন্ধু বিষয়ক "কুইজ" প্রতিযোগিতার জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক ছোট বই বাংলাদেশ থেকে নিয়ে তার ফটোকপি করে, তা সকল শিক্ষার্থীর মাঝে ফ্রি বিতরণ করি পড়ার জন্য।

:

আমার পুরো কাজে জেদ্দার আওয়ামী পরিবার হাততালি তথা "বাহবা দেয়" এবং ১৯৯৭-সনে এসকল কর্মকান্ডের জন্য "জেদ্দা কনসুলেট" আমাকে "সম্মানসূচক পুরস্কার" প্রদান করে (যার প্রত্যয়ন সংযুক্ত হলো)। কিন্তু জামাতিরা বসে থাকেনা চুপচাপ। তারা নিয়মিত আমার সকল কর্মকান্ড "গভীর পর্যবেক্ষণ" করতে থাকে ও ক্লাসে আমি কখন কি-কি বলি, তা তাদের ছেলে-মেয়েদের থেকে সংগ্রহ করে নিয়মিত। উল্লেখ্য, ১৯৭১-৭২ সনে জামাতি বড়-বড় রাজাকার, আলবদর-রা পাকিস্তানি পাসপোর্টে সৌদি আরবে গিয়ে "কমিউনিস্ট নাস্তিক বাংলাদেশে" তাদের দূরবস্থার কথা তুলে ধরে ওবং সৌদি সরকার এমন অন্তত ২০০০-বাংলাদেশ বিরোধীকে, তখনই সৌদি নাগরিকত্ব প্রদান করে। তারা সৌদি সরকারি বড়-বড় পদে দখল করে। রেডিও জেদ্দা, রাবেতা, ওয়ামি, সৌদি শরিয়াহ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ে মাদ্রাসায় পড়ুয়া ও আরবি জানার কারণে জামাতি এসব লোক বড় পোস্টে চাকরি পেয়ে যায়। এরাই মূলত সৌদি সরকারের সাথে লবিং করে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে সৌদিকে বিরত রাখে এবং বাংলাদেশ বিরোধী "প্রপাগান্ডা" চালাতে থাকে। এখনো জামাতের মূল শক্তি ও অর্থ জোগানদাতা হচ্ছে ঐ সৌদি গ্রুপ। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরক্ষণেই ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫ সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সেটাও হয়েছিল ঐ জামাতি লবিস্টদের কারণে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এই শক্তিশালী জামাতি গ্রুপ আমার ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং আমি দূতাবাস স্কুলে-কলেজে থাকলে, তাদের ছেলেমেয়েদের "ব্রেন-ওয়াশ" করে "কমিউনিস্ট তথা বাংলাদেশ প্রেমিক" বানিয়ে ফেলবো, এ চিন্তনে তারা তাদের সংগঠনের মাধ্যমে গোপনে আমার বিরুদ্ধে "ইসলাম বিরোধী ব্যক্তি" হিসেবে সৌদি শরিয়াহ তথা "যথাযথ স্থানে" অভিযোগ দায়ের করে। আমি দূতাবাস পরিচালিত কলেজে কাজ করলেও, আমার "স্পনসর" তথা “কফিল” ছিল সৌদি "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের" নামের ঐ কবি। মানে আমি দূতাবসের ভিসাধারী ছিলামনা। জামাতি শক্তিশালী গ্রুপ লবিং করে ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের অভিযোগ তুলে, ন্যুনতম ৪-জন পুরুষ সাক্ষী আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে, অত্যন্ত গোপনে আমার "শিরোচ্ছেদের অর্ডার" করে ফেলে। কিন্তু ঐ জামাতি গ্রুপের একলোক "টিচার হিসেবে আমাকে যোগ্য ও ভাল মানুষ" মনে করতো। রাজনৈতিক কারণে তিনি আমাকে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিতে চাইলেও, আমার "শিরোচ্ছেদ হোক" এটা জামাতি হলেও সে কামনা করতোনা। তাই বিষয়টা তিনি শেষ মুহূর্তে গোপনে আমার ভাইকে জানিয়ে দেন। সবশুনে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, আমার ব্যবসায়িক পার্টনার আরবি লোকজ কবি "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের"এর। শিরোচ্ছেদের চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আমার "ফাইল" তখনো সৌদি বাদশার কাছে যায়নি। ঠিক সেই মুহূর্তে "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের" এক সৌদি ক্ষমতাধর প্রিন্সকে বুঝিয়ে বলেন যে, "আমি একজন খুব ভাল মুসলমান, তার সাথে নিয়মিত নামাজ পড়ি, হজ্জ ওমরাহ করেছি এবং আমার বিরুদ্ধে এটা হচ্ছে, বাংলাদেশের "নিকৃষ্ট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র"! ঐ প্রিন্স সৌদির কথা বিশ্বাস করে ও সম্ভবত ব্যাপারটা বুঝতে পারেন কিন্তু যেহেতু "ওপর মহল" থেকে আমার "শাস্তি ঘোষিত হয়েছে", তাই তা একদম বাতিলের বদলে তা "লঘু" করে, তিনি আমাকে "শিরোচ্ছেদের বদলে" "ডিপোর্টেশন আদেশ" করাতে সমর্থ হন। যাকে আরবিতে বলে "খুরুজ আল আউদা" মানে "চিরদিনের জন্য বহিস্কার"। উল্লেখ্য, জেদ্দায় জামাতিরা আরবি ভাষা ও কোরান বোঝার একটা "নৈশ কোচিং" পরিচালনা করতো নাজলায়। কোরান বোঝা ও আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য আমি ঐ কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে প্রায় ৫/৬ মাস ক্লাস করেছিলাম। আমার উপকার হতে পারে মনে করে, আমার ভাই ঐ কোচিং পরিচালককে, এমন একটা "প্রত্যয়নপত্র" আরবিতে দিতে বলেন যে, “আমি সেখানে ভর্তি হয়ে কোরান ও আরবি ভাষা অধ্যয়ণ করেছি"। কিন্তু জামাতি ঐ লোক এমন কোন প্রত্যয়ন দিতে অস্বীকার করে। মানে তারা চাইছিলো আমার “শিরোচ্ছেদ” হয়ে যাক। এ ঘটনাকাল ১৯৯৯ সনের।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

শিরোচ্ছেদের অর্ডারকে "দেশ থেকে বহিস্কারে" নামিয়ে আনার পর একদিন ক্লাসচলাকালীন সময়ে আমার ক্লাসের সামনে এসে সৌদি পুলিশ আমাকে ডাক দেয় "তাআল" বলে। আমি তাদের অনুসরণ করি। তখন স্কুলের ক্লাসে আমার কন্যা নাবিলা ও কলেজের সামনের রাস্তায় আমার "নিশান সানি" গাড়ি পার্ক করা, আর আমার স্ত্রী আমার নাজলার বাসায় একা। সৌদি পুলিশ তাদের গাড়িতে বসিয়ে সরাসরি আমাকে জেদ্দা এয়ারপোর্টের রানওয়েতে নিয়ে আসে। তারা আরবিতে বলে যে, "তুমি একজন "মোদারেছ" (শিক্ষক) তাই তোমাকে সম্মান করছি আমরা। তোমার হাতে পায়ে শেকল দিয়ে, চোখ বেঁধে, বিমানে তুলে দেয়ার নির্দেশ ছিল আমাদের প্রতি। কিন্তু "মোদারেছ" হওয়াতে কেবল তোমার পায়ে শেকলটা দিলাম বাধ্য হয়ে। তখন বোর্ডিং ব্রিজ থেকে অন্তত ২/৩ কি.মি. দূরে ঢাকাগামী সৌদি জ্যাম্বোজেট দাঁড়ানো ছিল। আমাকে আনার অন্তত আধাঘন্টা আগেই সকল ঢাকাগামী যাত্রীকে বিমানে তুলে কেবল আমার জন্য বিমানটি অপেক্ষা করছিল। আমার দুহাত দুজন সৌদি পুলিশ ধরে, সামনের সিঁড়ি দিয়ে আমাকে বিমানে তুলে পায়ের শেকল খোলা হলো। এ বিমানগুলোতে সাধারণত শ্রমিকরা আসে বলে, পুরো ইকোনমিক ক্লাস তাই ঠাসা থাকে। বিমানের একজন সৌদি ক্রুর কাছে আমার বিষয়টা আরবিতে বুঝিয়ে বলে পুলিশদ্বয়। এও বলে ইনি একজন "মোদারেছ", তাই তাকে যেন যথাযথ সম্মান করা হয়। আমার পাসপোর্টটি বিমান ক্রুর কাছে দিয়ে আমার সাথে হাত মিলিয়ে আকস্মিক আমাকে দুজনে "স্যালুট" করে, নেমে যায় সৌদি পুলিশদ্বয়। তাদের স্যালুটে চোখে জল নামে আমার! পাইলট একা আমাকে বিজনেস ক্লাসে বসিয়ে রাখে। বিমান টেকাপ করার পর, আমার পাসপোর্ট আমার হাতে দিয়ে দেয় বিমান ক্রু!

:

জেদ্দা খবর রটে যায়, আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। আমার ভাইসহ আত্মীয় স্বজনরা স্থানীয় থানা ও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পাগলের মতো খোঁজ করতে থাকে আমায়। প্রায় ৭-ঘন্টা জার্নি-শেষে ঢাকা পৌঁছে জেদ্দা প্রথমে ভাইকে ফোন করি আমি যে, "আমি এখন নিরাপদে ঢাকায়"। আমার গাড়ি বিক্রয়, "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের" এর সাথে কিছু ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেব-নিকেশ শেষ করে প্রায় দুমাস পর আমার স্ত্রী ও কন্যা ফিরে আসে বাংলাদেশে। সব শুনে সান্ত্বনা দিতে আওয়ামী নেতারা গ্রুপ গ্রুপ করে (যেহেতু ৩-গ্রুপ ছিল সাপে-নেউলে সম্পর্কের) আমার জেদ্দার বাসায় আসে। তারা কেউ কেউ প্রতিশ্রুতি দেয়, আমার স্ত্রী ও কন্যার টিকেট করে দেবে। বাসায় ফেলে আসা আমার মালামালগুলো তারা বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজারকে বলে, ফ্রিতে বা কার্গোতে বা কোন কন্টিনারে দেশে যাতে পাঠানো যায়, তার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু কিছুই করেনি তারা। সব কিছু করেছে আমার সেই ভাই (যিনি এখন মৃত)। ঘরের দামি কার্পেট থেকে শুরু করে ফ্রিজ, ফ্যাক্স, ওয়াশিং মেশিন, ভিসিআর, টিভিসহ সকল মালামাল তিনি কার্গোতে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন নিজ খরচে। কোরিয়ান "সামসাং" সে ফ্রিজটি এখনো আমার বাসায় আছে ভাল অবস্থায়। আমার স্ত্রী ও কন্যাকে বিদায় জানাতে জেদ্দা এয়ারপোর্টে কজন আওয়ামী নেতা আসেন, যাদের পরামর্শে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক কাজ করতে গিয়ে, মূলত আমার এতোবড় "শাস্তি" হয়েছে! তারা কজনে সম্মিলিতভাবে একটা "চিকন সোনার চেইন" দিতে যায় আমার কন্যাকে। কিন্তু রাগে ক্ষোভে আমার স্ত্রী তাদের সামনেই ঐ চেইন ছুঁড়ে ফেলে দেয় অনেক দূরে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

দেশে ফেরার কদিন পরই পত্রিকায় "বিজ্ঞাপন" দেখি উন্নয়ন সহযোগী European Commission (EU) এর আর্থিক সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা Project-এ নানাপদে লোক নেয়া হবে। বিজ্ঞাপনে বর্ণিত "উপ-পরিচালক" (প্রোগ্রাম লিঁয়াজো অফিসার) পদের সব যোগ্যতা মিলে যায় আমার সাথে। ঐ প্রকল্পে "বিভাগীয় কর্মকর্তা" হিসেবে চাকরি হয় ২০০০-সনের এপ্রিলে আমার। ঐ প্রকল্পের আওতায় বৃটেনের প্লিমাউথে শিক্ষা ম্যানেজমেন্টে ওপর প্রশিক্ষণে ২০০২-সনে বৃটেনে যাওয়ার অর্ডার হয়, অপর ১১-জন সরকারি অফিসারের সাথে। কাতার এয়ারে যাত্রা ছিল আমাদের। মানে ঢাকা-দোহা-লন্ডন ফ্লাইট। দোহাতে ১২-ঘন্টার ট্রানজিট। টিকেটে বলা ছিল, এই ১২-ঘন্টা একটা ফোর-স্টার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করবে কাতার এয়ার আমাদেরকে। আমার নতুন পাসপোর্টের সাথে পুরনো পাসপোর্টটিও স্টাপল করা ছিল। প্রথমে সবার পাসপোর্ট জমা নিলো transit-transfer desk-এ. কিন্তু ১০-জনের জন্যে হোটেলের কুপন নিয়ে এলেও, আমাকে বললো, "তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে দেবোনা। কারণ সৌদি আরব থেকে তোমার পাসপোর্টে যে "সিল" দেয়া হয়েছে। তাতে বলা আছে, KSA & GCC-ভুক্ত কোন দেশেই ঢুকতে পারবেনা তুমি। সুতরাং তোমাকে লাঞ্চ, ডিনার, টি-কফির কুপন দিচ্ছি। কিন্তু এই ১২-ঘন্টা থাকতে হবে এই ট্রানজিট লবিতেই"। UK-থেকে ফেরার পথেও একই ঘটনা ঘটলো আমার সাথে। এই হলো আমার জীবন ট্রাকের আরেকটা না বলা কাহিনিকাব্য !

:

ছবি পরিচিতি

১। আমার সৌদি বন্ধু "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের"-র নেম কার্ড ও আমার সৌদি ড্রাইভিং লাইসেন্সের কপি।

২। জেদ্দা কনসুলেট থেকে আমাকে "সম্মানসূচক পুরস্কার" প্রদানের প্রত্যয়নপত্র।

:

নোট : জেদ্দা কিং আ: আজিজ ভার্সিটিতে কর্মরত (এখন মৃত) আমার ভাইর ইচ্ছে ছিল, আমি তারমতো "উত্তম ধার্মিক" হই। তাই তিনি তার আগ্রহে, তার খরচে ২০১৭-সনে "ওমরাহ" করাতে জেদ্দা নেন আমাকে। তখন পুরনো কার্ডের ঠিকানা ধরে "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের"কে অনেক খুঁজেছি আমি। কিন্তু তার সেই অফিস ভবনটি আর তখন সেখানে ছিলনা! সেখানে তখন পুরনো ৪-তলা ভবনের স্থানে ২০-তলা আধুনিক ভবন। আগের ফোন নম্বরও অচল ছিল তখন। কেউ চিনতে পারলোনা ১৯৯৯ সনের তায়েফের ঐ গীতিকবি "মোহাম্মদ ওসমান আল-শায়ের"কে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বৃটেন, রেবেকা ও কৃষাণ কিসসা

:

আজ বাবার সাথে আবার মন কষাকষি হলো আমার। কিছু টাকা চেয়েছিলাম তার কাছে কিন্তু তিনি এক পয়সাও দেবেননা আমাকে! মেজাজ গরম করে বললেন - "আমাকে না দিয়ে টাকা জলে ফেলে দেবেন তিনি কিন্তু আমার মত অকম্মা গাধার পেছনে আর পাই পয়সাও খরচ করতে রাজি নন তিনি"! অন্যদিনের মত আজও রেগেমেগে তিনি সবাইকে শুনিয়ে বললেন - "আমার পেছনে অন্তত সত্তর লাখ টাকা খরচ করছেন তিনি দেশে বিদেশে পড়াতে! কিন্তু আমি এমন গাধামি করবো, তা জানলে সত্তর পয়সাও খরচ করতেন না তিনি! বরং গ্রামে তার জমিতে চাষবাস করার জন্য চাষাভুসা বানাতেন আমায়, যেমন বছরভিত্তিক তার জমিতে কাজ করছে ৩-কামলা"! আমি রাগ না করে হেসে বলি - "চাষাইতো হতে চাইছি বাবা আমি! কিন্তু তুমিতো হতে দিচ্ছো না"! আরো এক ডিগ্রি রেগে বাবা বললো - "যদি তাই হবি, তবে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়লি কেন? PhD করতে লন্ডন গেলি কেন? কেন খরচ করলি আমার নগদ সত্তর লাখ টাকা? যা দিয়ে চরে অন্তত দশ একর জমি কিনতে পারতাম আমি"! আবার সহজভাবে হেসে বলি - "বাবা! জমিতো কম নেই তোমার! আর কত জমি লাগবে তোমার"? বাবা এবার একটু স্বর নামিয়ে বললো - "তোর জন্য লন্ডন টাকা পাঠাতে শহরের পাঁচ কাঠার প্লটটি মাত্র ৫০-লাখ টাকায় বিক্রি করতে হয়েছে আমাকে। যা থাকলে এখন দাম হতো দুই কোটি টাকা"! আর কথা বাড়াই না বাবার সাথে। কথায় আরো কথা বাড়বে। তারচেয়ে নদীর তীরে চলে যাই জলের কাছে। যেখানে জেলেরা এ দুপুরে তাদের নৌকো ঘাটে লাগিয়ে ইলিশ জাল মেরামত কাম বিশ্রাম করছে! ওদের মাঝে গেলে এক প্রশান্তি ঘিরে ধরে আমায়!

:

বাবা মায়ের অনেক আশা ছিল আমাকে নিয়ে। বাবা চাইতেন বিদেশে লেখাপড়া করে অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকা সেটেল হই আমি। বাবা যেন বুক উঁচু করে গ্রামের মানুষদের বলতে পারে - তার ছোট ছেলে 'সিডনি' বা 'ওয়াশিংটন' থাকে। প্রতিবছর আমাকে যেন রিসিভ করতে যেতে পারে ঢাকা এয়ারপোর্টে। কিন্তু তার কিছুই হয়নি আমায় দিয়ে। বাবার কথামত ঠিকই বৃটেন গেলাম আমি PhD ডিগ্রি আনতে। বৃটেনের লিডস ইউনিভার্সিটিতে এমফিল আর ডক্টরাল কোর্স শেষ করতে করতে দুবছরের স্থলে চার বছর লাগলো। ভাল ফলাফলের আশায় কোন পার্টটাইম জব বা উপরি ইনকামের কোন পথেও গেলাম না আমি। খরচের পুরো টাকাটাই নিলাম বাবা থেকে। সাথে জুটে গেলো ঢাকার গুলশানের হাস্যজ্জ্বল মেয়ে রেবেকা। সেও পড়ে লিডস ভার্সিটিতে! তবে আমার মত ল্যাংগুয়েস্টিকে নয়, তার সাবজেক্ট "মাইক্রোবায়োলজি"। রেবেকার বাবা ঢাকার কোন মন্ত্রণালয়ের সচিব যেন। সরকারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাই কিভাবে যেন লন্ডনে এক ফ্ল্যাটও কিনেছে তারা। নিজেদের ফ্ল্যাটে থেকে লিডস ভার্সিটিতে পড়ে ঢাকার মেয়ে অনিন্দসুন্দরী রেবেকা পাটোয়ারী। আমি ঢাকা থেকে যাওয়ার পরের সেমিস্টারেই রেবেকা ভর্তি হয় ওখানে। লিডসে বাংলাদেশী স্টুডেন্ট খুব বেশি নয়। তাই রেবেকার সাথে সপ্তাহ খানেকের মাঝেই পরিচয় হয় ক্যান্টিনে। পরিচয়ের পরদিন থেকেই কাকতালীয়ভাবে দুজনে একসাথে লাঞ্চে উপস্থিত হই প্রায় একই সময়ে। এবং এভাবে আমি একদিন লাঞ্চ করাই রেবেকাকে আর রেবেকা অন্যদিন করায় আমাকে অল্টারনেটিভ! বৃটেনে এমনই নিয়ম! দুবন্ধু একসাথে খেলেও যার যার বিল, সে সে পরিশোধ করে আলাদা!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ভার্সিটি ক্যান্টিনে নিয়মিত লাঞ্চ করতে করতে কখন দুজনে মনের কাছাকাছি চলে আসি বুঝতে পারিনা আমরা। ক্লাসের ফাঁকে কিংবা ছুটির দিনগুলোতে রেবেকা আর আমি চষে বেড়াতে থাকি বৃটেনের এমাথা ওমাথা। ওর টাকা পয়সার অভাব ছিলনা। ফ্ল্যাটভাড়ার টাকাতে ওর খরচ চলে যায় নির্বিঘ্নে। আর আমিও বাবার থেকে নিয়মিত নিতে থাকি লাখ লাখ টাকা। আর কদিন মাত্র হিসেব করে বাবা তার শহরের একমাত্র জমিটি বিক্রি করে টাকা পাঠাতে থাকেন আমায় নিয়মিত। এবং চার বছর রেবেকার সাথে এক আনন্দঘন সময় পার করে শেষ করি আমার 'থিসিস'। রেবেকার ৫-বছরের মাস্টার্স শেষ করতে তখনো আরো বছর খানেক বাকি। আমি দেশে ফেরার উদ্যোগ নিতে রেবেকা বাঁধা দেয় আমায়। তার সাথে বৃটেনে তার ফ্ল্যাটেই থেকে যেতে বলে আমায়। যেন দুজনে সেটেল হতে পারি ওখানের বরফ জমা মাটিতে। কিন্তু আমি শুনিনা রেবেকার কথা। মা চাইছিল পড়ালেখা শেষ করে দেশে ফিরে বড় কোন সরকারি জব করি আমি শহরে। যাতে মা আমাকে দেখতে পারেন নিয়মিত। কিন্তু বাবা চাইতেন রেবেকার মত। বৃটেন না হলেও, অন্য কোন 'এ' গ্রেডের দেশে যেন চলে যাই আমি "ইমিগ্রান্ট" হয়ে। প্রয়োজনে বাবা আরো টাকা দেবেন এ ব্যাপারে। কিন্তু কারো কথা না শুনে, একদিন বোচকা-বেডিং গুছিয়ে হিথরো থেকে আমিরাত এয়ারে উঠে বসলাম ঢাকা ফিরতে। যথারীতি বাবা ঢাকা এয়ারপোর্টে এলেন আমায় রিসিভ করতে। দুবাই থেকে আগত ফ্ল্যাইটে লেবার কিছিমের অনেক যাত্রীর চাঁদরে বাঁধা গাট্টি টাইপের লাগেজ দেখে বাবা নাট সিঁটকিয়ে বলেন - "বিমানটাকেই নষ্ট করলো এ যাত্রীরা। এদের জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করা উঁচিত! এ লেবার ফ্লাইটে এলি কেন তুই"?

বাবার ভাড়া করা এসি মাইক্রোতে এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি চলে গেলাম বরিশাল গ্রামের বাড়ি যেতে। যেখানে অপেক্ষা করছে মা আমার জন্যে। বরিশাল থেকে বিশেষ লঞ্চে গ্রামে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যে হলো আমাদের। মোবাইলে সংবাদ পেয়ে মা ঘাটে এসে জড়িয়ে ধরলো অনেকদিন পর দেখা তার ছোট নাড়িছেঁড়া ধন ছোটছেলেকে। আমি সকাল-বিকেল গ্রামে, নদীর তীরে, গাঁয়ের বাজারে ঘুরছি আর মায়ের হাতের নানাবিধ খাবার খাচ্ছি দেখে বাবা একদিন বললেন

- তো বাবা এখন কি প্লান? কোন দেশে সেটেল হবে? লাইনঘাট কিছু কইরা আইছো?

- না বাবা করি নাই কিচ্ছু! আমি যামুনা কোনো দেশে। মার আঁচল তলে এখানেই থাকুম!

- এখানেই থাকবা মানে?

- মানে এ গ্রামেই থাইকা যাইতে চাই আমি! নিজের গাঁ! নিজের মা! তুমি! রাগে বাবা দিন চারেক কথা বললোনা আমার সাথে। মা একদিন বললেন -

- বাবা তোকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা! তোর বাবা চায় তুই বিদেশে ভাল কোন দেশের নাগরিক হ! আমরা যেন বেড়াইতে যাইতে পারি! মাঝে মাঝে আইবি তুই বেড়াইতে!

- তোমার ইচ্ছেডা কি মা?

- তুই ঢাকা থাইকা ভাল একটা চাকরি করলেই আমি খুশি হই রে বাবা!

- কিন্তু মা! আমি বিদেশেও যামুনা! ঢাকাও যামুনা! এ গ্রামেই থাইকা যাইতে চাই তোমার আঁচল তলে। কথা শুনে মুখ টিপে হেসে মা বললো --

- তবে তোর বাবার এত্তো ট্যাকা খরচ করলি ক্যান?

- বাবার এতো ট্যাকা! খরচ করমু নাতো কি করুম? আমি খরচ না করলে ট্যাকা ইন্দুরে খাইবো মা!

- তাইলে রেবেকার কি হইবো? তোর সাথে সে কি এই গ্রামে থাকবো? আমাদের ঘর, পুকুরে গোসল, মাটির চুলায় রান্না কি পছন্দ হইবে তার?

- না মা তার পছন্দ না এই গাউয়া গ্রাম। হ্যারে নেটে ছবি দেখাইছি। তাই আসবো না সে। তার সাথে সম্পর্ক শেষ কইরা আইছি মা! শুনে মা আকাশ থেকে পড়ে যেন। চোখেমুখে একরাশ দুশ্চিন্তা এনে বলে - তাইলে কি তোরে বিয়ে করবো না সে?

- না মা করবো না! এটা কি সম্ভব? যার বাবা সচিব! যে মেয়ের বাড়ি আছে লন্ডনে! সে এসে থাকবে এই চরাঞ্চলে? যেখানে রাতে ঘুটঘুইটা অন্ধকার। কোন কারেন্টের ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই এই চরে ! নেট নাই ডিস নাই পেপার পত্রিকা টিভি নাই!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

- ভাল কথা বাবা! তয় আমার চাচাতো বোনের মাইয়া পারুলকে আনি তোর লাইগা? পারুলকে খুব পছন্দ আমার। পরীর মত চেহারা তার! রেবেকার চাইতে সুন্দর দেখতে! মনে মনে আমারে শাশুড়ি বানাইতে চায় সে! আমি ওখানে গেলেই আমার চুলে ঠান্ডা তেল দেয় ঢাইলা! কি যে যত্ন করে আমার!
হেসে মাকে বলি - কি যে কও মা! তুমিতো জানো রেবেকার সাথে আমার ৪-বছরের সম্পর্ক! এখন বিয়ে করুম পারুল লারে?
- কিন্তু তুইতো কইলি রেবেকা কোনদিন আইবো না এই চরে!
- না আইলে থাউক। বিয়ার দরকার নাই মা আমার। আপাতত আমারে গ্রামের আলোবাতাসে আর তোমার আঁচলতলে থাকবার দাও মা। বলে আবার হেসে মায়ের আঁচল টেনে মাথায় দেই আমি! তা দেখে খুশীতে মা জড়িয়ে ধরেন আমায়! মা আসলে চায় - "আমি তার আঁচলেই থাকি চিরকাল"!
:
বাবা আমার সাথে কথা বলেননা অনেকদিন হলো। কোন বিশেষ দরকার হলে মায়ের মাধ্যমে বলেন। ঘরে তেমন কোন কাজও করিনা। প্রথমত বাড়ির পাশের প্রাইমারি স্কুলটিতে সকাল দশটার দিকে একটা ভাষাভিত্তিক ক্লাস নেই। যে স্কুলের হেডটিচার আবার আমার মায়ের পেটের আপন বোন। আর মাঝে মাঝে আমার পুরনো হাইস্কুলে দুয়েকটি সাহিত্য বা ভাষার ক্লাস নেই সখ করে, যে স্কুলে পড়তাম আমি কৈশোরে। হাতে যে কটা টাকা ছিল, তা খরচ করে দুস্কুলেই সকল স্টুডেন্টকে দৃষ্টিনন্দন ব্যাচ বানিয়ে দিয়েছি। আর নানাবিধ ছবি কিনে, আর্ট করিয়ে বৃটেনের স্কুলগুলোর মত ক্লাসরুমগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছি। এখন মনেই হয়না এ স্কুল দুটো চরাঞ্চলের কোন গ্রামের স্কুল। এরপর একবেলা বিলে বিলে হাঁটি। জমিতে চাষরত কৃষাণদের নানাভাবে পরামর্শ দেই, যাতে ভাল ফসল চাষ করে তারা তাদের জীবনমানের উন্নয়ন করতে পারে। যেমন আমাদের গাঁয়ের লোকেরা যে জমিতে কুমড়ো বা খেসারী ডালের চাষ করে খুব কম আয় করতো, ঐ জমিতে 'স্ট্রবেরী' চাষ করে অনেক বেশি টাকা আয় করতে পারে তারা। প্রথম বছর স্ট্রবেরী চেনেনা বলে দু হাজার টাকার ফল কিনে ফ্রি খাওয়ালাম তাদের। পরর বছর অন্তত কুড়ি হাজার টাকার চারা বা লতা কিনে ফ্রি বিতরণ করলাম তাদের মাঝে। নেট থেকে ইউটিউবে চাষ করার পদ্ধতি দেখে উঁচু বেলে মাটিতে চাষ করলো তারা। দুশ টাকা কেজিতে ফল বিক্রি করতে পেরে পরের বছর গাঁয়ের অনেক কৃষক শুরু করলো বিদেশী ফল স্ট্রবেরীর চাষ!
:
মাঝে মাঝে ওদের পক্ষে ওকালতি করতে থানা সদরের কৃষি অফিস বা সরকারি ব্যাংকে যাই লোন পাশ করাতে। এসব কাজে আসা-যাওয়াসহ নানাবিধ খরচ হয় আমার পকেট থেকে। বাবা দেয়না, তাই মার থেকে টাকা নেই নানাভাবে! কৃষকদের থেকে একপয়সাও নেইনা আমি, বরং আমার টাকাতে হোটেলে ভাত খায় তারা কখনোবা। আমার এসব কাজকে বাবা ও গ্রামের অনেক মানুষ 'পাগলামি' বলে। আমার অপুস্থিতিতে তারা বলে - "বেশী পড়ালেখা করে মাথায় গন্ডগোল হয়েছে আমার'! পাগলা গারদে পাঠানো দরকার এখন"! আর আমাকে ভালবাসে যারা মনপ্রাণ উজাড় করে, তারাও বলে - "স্যার! গ্রামে আমাগো লগেই যদি থাকপেন, প্রাইমারি স্কুলেই যদি মাস্টরি করবেন, তয় লন্ডন গেলেন কির লাইগা"? কথা শুনে হেসে বলি - "পড়ালেখা করতে"। তারা অবাক হয়ে বলে - "গ্রামে এইসব কাম করতে কি অত পড়ালেখা করা লাগে"? তাদের বোঝাতে পারিনা আমি যে, আসলে পড়ালেখা কি জিনিস ও তার দৌঁড় কতদূর! ওদের সরলতায় বরং হেসে মরি আমি! একদিন বাজারে জেলে-কৃষকদের এক আড্ডায় বলি - "তোমাদের মত এ গাঁয়ের আলো বাতাস আর মাটিতে বড় হইছি আমি। পুরো কৈশোর কাটাইলাম এ নদীর জলে সাঁতার কাইট্টা! তাইলে এ গ্রামের ঋণ শোধ করতে অইবো না আমারে! ঋণ শোধ করতে থাইকা গেলাম এ গ্রামে রে ভাই"! কথা শুনে অশ্রুসজল চোখে অনেক চেনা কৃষক আর জেলে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমাদের গাঁয়ের মূল বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নতুন জেগে ওঠা বালির চরে এখনো চাষবাস শুরু করেনি মানুষ। ওখানে কেবল ঘাস আর হোলগাপাতার চারা গজিয়েছে, যা চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করে গাঁয়ের মানুষজন। এ জমি আমাদের গ্রামেরই লোকজনের। সাত-আট বছর আগে নদীতে ভেঙে এখন আবার জেগেছে নতুন চর হিসেবে। তাই মালিকানাও আমাদের গ্রামের মানুষেরই, যাদের সবাইকে কমবেশি চিনি আমি। একদিন সকল জমি মালিকদের নিয়ে গেলাম জেগে ওঠা ঐ নতুন চরে। সব দেখেশুনে তাদের প্রস্তাব দিলাম - "পুরো জমিতে আধুনিক হাইব্রিড তরমুজ লাগাবো আমরা। উন্নত বিদেশী বীজ শহর থেকে আনবো আমি। সার কিংবা আর যা যা লাগে তারও সব খরচ দেব আমি। এখন জমি মালিকরা প্রতি শতক জমি ৪০০ টাকা হিসেবে এক সিজনের জন্য 'লিজ' দিতে পারে আমাকে কিংবা তরমুজ চাষে অংশ নিলে লাভের অর্ধেক পাবে তারা"। সকল কিষাণ 'লিজ' দেয়ার পরিবর্তে আমার সাথে ৫০% ভাগাভাগিতে তরমুজের চাষ করতে রাজি হয়। ওদের সাথে এভাবে একটা মৌখিক চুক্তি করি আমি!

:

পুরো জমিতে বেলে পলিযুক্ত ঝুড়ঝুড়ে দোআশ মাটি। সকল জমি চাষের বদলে কেবল ছোট ছোট গর্ত করতে বললাম কৃষকদেরকে যার যার জমিতে। প্রণোদনা হিসেবে একটু পর পর চা-মুড়ি কিংবা চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করলাম ওদের জন্য কর্মস্থলে। নির্দেশনামত জমি গর্ত করার পরের দিন প্রতিটা গর্তে এক ঝুড়ি গোবর সার দিলো সবাই। যা গ্রামে গোয়ালঘরে এমনতিই পাওয়া যায়। আমি বই ঘেটে তাতে কিছু রাসায়নিক সার দিয়ে দিলাম। সপ্তাহখানেক পর হলুদ, কালো আর সবুজ এ তিন রংয়ের তরমুজ বীজ দিলাম কৃষকদের হাতে। তারা প্রতিটি সার দেয়া গর্তে তিনটে করে বীজ পুতে দিলো। কদিনেই মাথা তুললো শিশু তরমুজ চারা। আমার কিনে দেয়া সার কীটনাশক নিয়মিত জমিতে ছিটিয়ে একদিন প্রচুর ফুল আসলো নতুন তরমুজ খেতে। দেখতে দেখতে ছোট নরম তরমুজ 'গোটা' বড় তরমুজে রূপান্তরিত হলো। হলুদ, কালো আর সবুজ রঙের তরমুজে ভরে উঠলো মাঠ। নদীর তীর ঘেষে ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগলো চলমান লঞ্চের যাত্রীরা। কেউ কেউ লঞ্চ বা বোট থামিয়ে কিনে নিতে চাইলো দুচারটে তরমুজ শখ বসত। বিশাল চরের চার কোনায় চারটি অস্থায়ী "টংঘর" তুলে দিলাম কৃষকদের জন্যে। তারা পালা করে তাতে দিনে ও রাতে পাহারা দিতে থাকলো নিয়মিত। যাতে রাতে চুরি না হয় তরমুজ!

:

এর মধ্যে একদিন পরিপক্ক হলো তরমুজ। মাকে একদিন নিয়ে এলাম ক্ষেত দেখাতে। মা শর্ত জুড়ে দিলো সাথে তার পছন্দের পারুল থাকবে। তাই হলো। আমি মায়ের আঁচলতলে ঢুকে ছাগলছানার মত লাফিয়ে লাফিয়ে পুরো ক্ষেত হেঁটে হেঁটে দেখালাম তাকে আর পারুলকে। পারুলের জন্য আমার খুব মায়া লাগে কিন্তু খুনঁসুটিতে না আবার রেবেকার স্থান দখল করে নেয় সে, তাই টানকে অবদমিত করে দূরে থাকি রূপশ্রী মোহময়ী পারুল থেকে! কৃষাণরা লাল টকটকে তরমুজ কেটে খাওয়ায় অতিথি দুজনকে। মা আশীর্বাদ করলেন আমাদের সবাইকে, যেন বিশ্বসেরা তরমুজ ফলাতে পারি আমরা! কিন্তু বাবাকে বারবার অনুরোধ করেও আনতে পারলাম না এখানে একবার। যদিও বাবা আজন্ম কৃষক। কিন্তু তার বিলাত পড়ুয়া ছেলের কৃষিকাজ একদম পছন্দ নয় তার। ছোটছেলের এমন 'পাগলামি'তে হাঁটে-বাজারে মুখ দেখাতে পারেন না নাকি বাবা! বেপারীরা এলো তরমুজ কিনতে একদিন। ভাল দাম পেতে বেশ কজন বেপারীর সাথে যোগাযোগ করলাম আমি। যারা ট্রলার ভরে সরাসরি তরমুজ চালান করে ঢাকায়।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

মুমিনুদ্দি বেপারীর সাথে পাকা হলো কথা! ছোট আর মাঝারি যা এখনো পরিপক্ক হয়নি সেগুলো বাদ দিয়ে, কেবল বড় সাইজগুলো কেটে নেবে সে, যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে 'প্রথম পাতনা'। পুরো চরের জমিতে দেবে ৪-লাখ টাকা। কিন্তু আমরা ৫-লাখের কমে রাজি হলামনা। শেষে সাড়ে চার লাখে ফাইনাল হলো পুরো চর। আগামী শুক্রবার থেকে তরমুজ কাটা শুরু করবে বেপারী। প্রতি শতকে দুটো করে তরমুজ রেখে যাবে কৃষাণদের "খোরাকি" হিসেবে। আর মাঝারি ও ছোটগুলো এক দেড় মাস পর আবার বিক্রি করতে পারবো আমরা '২য় পাতনা' হিসেবে। নির্দিষ্ট শুক্রবারে তরমুজ কেটে জড়ো করতে লাগলো মুমিনদ্দির লোকজন। আমরা ঘাসের বিছানায় বসে বসে তাদের তরমুজ কাটা দেখছি। আকস্মিক ম্যাসেঞ্জারে কল এলো রেবেকার। ঢাকাতে এসেছে সে। আমার অবস্থান জানতে চায় এখনই। চরের তরমুজ ক্ষেতে কৃষাণদের সাথে বসা আমার ছবি তুলে পাঠালাম রেবেকাকে তাৎক্ষণিক হোয়াটসআপে। বললাম - "পুরোদস্তুর কৃষক আমি। তরমুজ বিক্রি করছি বেপারীদের কাছে"। আমার অবস্থান জানতে চাইলো রেবেকা। গুগল ম্যাপের 'স্কিনসট' পাঠিয়ে তাকে বললাম - "এ চরে আছি আমি এখন"। তাতে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংসও বলে দিলাম তাকে। যেন 'হাবল' টেলিস্কোপে চোখ রাখলে স্পষ্ট দেখতে পায় সে আমায়!

:

মুমিনুদ্দি বেপারীর লোকজন তরমুজ বোঝাই করেছে তার ট্রলারে। ক্ষেত তদারকিতে দুপুর নাগাদ বলতে গেলে ভুখা আমরা সবাই। তাই সব কৃষক জড় হলো ক্ষেতের এক পাশে। এবার তরমুজ দিয়ে হবে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ। কৃষাণরা দশ বারোটি তরমুজ ভাগ করে কেটে রাখলো আমাদের সামনে। সবাই এলে শুরু করবো আমরা। তরমুজ কাটা দেখতে মাকে আনিয়েছি লোক পাঠিয়ে। সে আর পারুলও যোগ দিয়েছেন আমাদের এ ফসল কাটা উৎসবে। পারুলকে মা মোবাইল করে এনেছে, যেন পারুলের মোহনীয় রূপ দেখে পছন্দ করি তাকে। আকস্মিক আকাশে চকচকে নীল হেলিকপ্টার চোখে পড়ে আমাদের। মনে করেছিলাম কোথাও হয়তো চলে যাবে হাতিয়া সন্দ্বীপ কিংবা মনপুরা। কিন্তু হেলিকপ্টার উড়ে এলো একদম আমাদের ক্ষেতের ওপরে। একটু নিচ দিয়ে কটা চক্কর দিয়ে যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন হয়েছে আমাদের, ঠিক সেখানেই নামলো কপ্টারটি। বাতাসে উল্টে যেতে থাকলো তরমুজ ক্ষেতের লতা আর ছোট তরমুজ নাতি পুতিরা। লন্ডনে আমার কিনে দেয়া প্রিয় সানগ্লাসটি পরে রেবেকা নামলো হেলিকপ্টার থেকে। আমি বিস্ময়াভূত হয়ে তাকিয়ে রইলাম রেবেকার দিকে। সে কাছাকাছি এসে বললো - "আমাকে ছাড়াই চরের লাঞ্চ সারবে একাকি? ইউকের ক্যান্টিনের কথা ভুলে গেলে সব? আমাকে সাথে নেবেনা লাঞ্চে"? মা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো নীল গেঞ্জি আর নীল ট্রাউজার পরা আধুনিক মেয়ে রেবেকার দিকে। কাছাকাছি এলে বললো - "তুমি কি রেবেকা"? রেবেকা হেসে বললো - "হ্যাঁ মা, আমিই সেই হতভাগি! যাকে ছেড়ে এসেছে আপনার ছেলে লন্ডনে। সে তো আর লন্ডন যাবেনা। তাই আমিই চলে এলাম আপনাদের তরমুজ ক্ষেতে"! আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম লাস্যময়ী রেবেকার দিকে। ঢাকা থেকে আগত কপ্টার উড়াল দিল ঢাকার দিকে। রেবেকা বসে পড়লো কাটা তরমুজের পাশে আমাদের ঘাসের বিছানায়! যেখানে আয়োজন করা হয়েছে আমাদের দুপুরের ভোজের। দখিনা বাতাসে চুল উড়ে যাচ্ছে রেবেকার! পারুল অশ্রুভেজা চোখে তাকিয়ে রয়েছে রেবেকা, মা আর আমার দিকে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সীমান্ত মানুষের প্রেম ও জীবনগাঁথা

:

বাংলাদেশের জীবননগরের পুটখালি গ্রামে বাড়ি আমার। এ গ্রামটা ভারত বর্ডারের খুব কাছাকাছি। ভারতের ভজনঘাট এলাকার মানুষজন, হাঁটবাজার দেখা যায় আমাদের পুটখালি থেকে। কৃষি শ্রমিকের কাজ করি আমি পুটখালিতে। কিন্তু কদিন থেকে এলাকাতে কোন কাজ পাচ্ছিনা। বলতে গেলে বেকার জীবন কাটাচ্ছি সপ্তাহখানেক থেকে। ঘরে মা-বাবা, ভাই-বোন ৭-জনের সংসার। চাল ডাল তেল নুন সব কিনে খেতে হয় সংসারে। তাই সংসার চালাতে ঘরের ঘটি বাটি বিক্রি শুরু করেছি কদিন থেকে। কি করবো ঠিক বুঝতে পারছি না। শেফালির বাড়িও এই পুটখালিতেই। একদম বর্ডার লাগোয়া ওদের বাড়ি। বলতে গেলে ওর বাড়ি থেকে এক দৌঁড়ে পৌঁছা যায় ভারতের ভজনঘাট গ্রামে। শেফালিও চিন্তিত আমার জন্য। বাবা ওকে বিয়ে দিতে চায় ভ্যানচালক ফয়সাল মিয়ার সাথে। কিন্তু শেফালি মইরা গেলেও বিয়ে করবেনা ফয়সালকে। সে আমার গলায় মালা দিতে প্রতিদিন বর্ডারে ফুল তোলে।

:

আমার সাথে মাঠে কাজ করতো সেই কাল্টু দর্জি বর্ডারে কি কাজে যেন লেগেছে কদিন থেকে। সারাদিন ঘরে ঘুমোয় নাক ডেকে। আর রাতে বর্ডারের এপার ওপার আসা-যাওয়া করে। তাতেই নাকি প্রতিরাতে তার ইনকাম হাজার পাঁচেক টাকা। গতকাল বিকেলে পুটখালি বাজারে দেখা হয়েছিল ওর সাথে। ১০-টাকা দিয়ে ঘন 'মালাই চা' খাওয়ালো আমাকে। বেশ কড়কড়া টাকা দেখলাম হাতে ওর। আমাকে অনুরোধ করলো, তার সাথে বর্ডারের কাজে যোগ দিতে। এ কাজে নাকি আয় খুব ভাল। তা ছাড়া নগদ লেনদেন, কোন বাকি নাই। যদিও কিছুটা "রিস্ক" আছে রাতে বর্ডার পার হতে। আর রিস্ক বলেইতো একদিনের ৩০০ টাকার লেবারের দাম এক রাতের বর্ডারে পাঁচ হাজার টাকা!

:

মহাজন কাদের মল্লিকের কাছে এক বিকেলে নিয়ে যায় কাল্টু দর্জি আমাকে। বিশাল কারবার কাদের মল্লিকের। তবে গরুর ব্যবসায়ই প্রধান। ভারত থেকে গরুসহ নানাবিধ জিনিস আনে সে প্রতিদিন প্রতিরাতে। আমার কথা শুনে তিনি হেসে বললেন - "গরু চুরি কইরা আনি না মিয়া, নগদ ট্যাকায় কিনা আনি"। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাল - "তাহলে বর্ডারে বিএসএফ বিজিবির সমস্যা কি"? হেসে মল্লিক সাব বলে - "বাংলাদেশের বিজিবির তো সমস্যা নাইরে বাই। সব সমস্যা হইলো মালাউন বিএসেফের। তেল আনো সাবান আনো চিনি আনো কুনু সমস্যা নাই, কেবল গরু দেখলেই ওগো প্যাট কামড়ায়! হালার মালাউন"! চোখ কপালে তুলে বলি - "গরুতে ওগো পেট কামড়ায় ক্যা মহাজন সাব"? আবার বলেন কাদের মল্লিক - "বোজো না? হিন্দু ওরা। গরুরে মা কয়! তাই গোস্ত খাইবার দিতে চায়না। গরু আর কারে কয়"! হাঁ হাঁ করে হাসেন কাদের মল্লিক। এবার মল্লিক সাহেব কাঁধে হাত রাখে আমার। বলে - "চিন্তার কোন কারণ নাই বাপু। এপারে সব কথা বলা আছে আমার। এপারে টু শব্দটি হইবো না। আর ওপারে আছে আমার বেপারী বন্ধু জগদীশ সাহা। তার খাটালের গরুই আনি আমি। উনি লাইন ঘাট করেন বর্ডারে। যখনই মোবাইলে ডাক দেন লোক পাঠাই আমি গরু আনতে। তাই চিন্তার কোন কারণ নাইরে বাই"!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বাড়ি ফেরার পথে বন্ধু কাল্টু অভয় দেয় আমাকে। বলে - "আরে দোস্ত! আমিতো গত ১২-দিন ধইরা এ কাম করতাছি। একবার মাত্র তাড়া খাইলাম। কিন্তু গরু ফালাইয়া পলাইয়া আইছি। ধরতে পারেনাই আমারে। তয় ঐ রাতে ট্যাকা দেয় নাই মল্লিক সাব আমারে। কয় ১০ হাজার টেকার গরু ফালাইয়া আইছো, আবার টেকা"? বাড়ি না গিয়ে শেফালিদের বাড়ির দিকে হাঁটা দেই আমি। উঠান লেপছে শেফালি গোবরজল দিয়ে। বাবা গেছে বর্ডারের দোকানে কি কাজে যেন। গলার খাকাড়ি শুনে শেফালি চোখ তুলে চায় আমার দিকে। প্রেমিকার চোখে মুখে সুখমাখা মিষ্টি হাসি হেসে বলে - "কদিন পর আইলা? মনে পললো আমার কথা"? কাজ না থাকার কথা ভেঙে বলি শেফালিকে। 'তাই মন খারাপ ছিল' এটা বলার পর কাদের মল্লিকের প্রস্তাব তুলে ধরি শেফালির কানে। বন্ধু কাল্টু দর্জি এ কাজ করে ভাল টাকা আয় করছে তাও জানাই শেফালিকে। মনে করেছিলাম শেফালি এ কাজে বাঁধা দেবে আমাকে। কিন্তু তেমন বাঁধা দিলোনা সে। বরং বললো - "গ্রামের অনেকেইতো এ কাজ করছে। বাবাতো কাজ করে সফিক মাঝির খাটালে। তুমি করলে দোষ কিবা"? চুরি বাটপারিকে খুব একটা দোষের মনে করেনা শেফালি। বরং তার বাবাও এ কাজে সাহায্য করবো বলে আমাকে জানালো শেফালি হেসে হেসে। শেফালি চায় টাকার অভাবে তার বিয়েটা যেন আটকে না থাকে আর। বরং আমি রোজগার করে যেন তাকে তুলে নিতে পারি আমার ঘরে খুব শীঘ্রই নতুন বউ হিসেবে!

:

শেফালির মতামত পেয়ে সন্ধ্যার পরই কাল্টুর সাথে মহাজন মল্লিকের বাড়ি উপস্থিত হলাম সাহসে ভর করে। আমি নতুন বলে বুকে সাহস আনতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা মল্লিক সাব অগ্রিম দিলেন আমায়। হাত ধরে বললো - "ভয় পাওয়ার কুনু কারণ নাই মিয়া। তোমরা রাইত ১১-টার দিকে বর্ডার পার হইয়া জগদীশ সাহার বাড়ি যাইবা। বর্ডারের সব ঠিক থাকলে তোমাদের হাতে গরু তুইলা দিবো তেইনে। তোমরা গরু খেদাইয়া খাল পার হইয়া বাংলাদেশে চইলা আইবা। ব্যস, তাতেই ইনকাম নগদ পাঁচ হাজার টেকা"। নিজেদের বাড়ি একটু দূরে আমার। তাই কাছের শেফালির বাড়িতে ঢুকে তার কাছে গচ্ছিত রাখি মহাজনের দেয়া টাকাটা। কারণ সাথে টাকা থাকলে সব রাইখা দেয় নাকি বিএসএফ বিজিবি। একটা ছোট মোবাইল দিয়েছিল মহাজন সাব আমারে পথে কথা বলার জন্যে। শেফালিকে নাম্বারটা দিয়া বলি - "ফিরা না আইলে মাফ কইরা দিও"! বুকে ধুকধুক বুক রেখে অশ্রু ঝড়ায় শেফালি। বলে - "যাও! আল্লাহর নাম নিয়া। ফোনে কথা কমু তোমার লগে রাইতে"!

:

রাত ১১-টার দিকে আমাদের ৫-জনের গ্রুপ অন্ধকারে বর্ডারের দিকে এগুতে থাকি। যে খালে নেমে পাড় হবো আমরা, তার অপর পাড়ে টহলরত ভারতীয় বর্ডারের বিএসএফ গার্ড দেখতে পাই। আমরা জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকি অনেকক্ষণ। প্রায় ঘন্টাখানেক পর পশ্চিম দিকে হাঁটতে থাকে ওরা। এই ফাঁকে আমরা পাঁচজনে এক দৌঁড়ে ঢুকে যাই ভারতীয় অংশে। ওপরে উঠে মাইল খানেক হেঁটে পৌছে যাই জগদীশ সাহার বাড়ি। আমাদের খোলা উঠানে বসিয়ে শীত রাতের চা খাওয়ান জগদীশ বাবুর কর্মচারী গণেশ। চা খেয়ে শীতের রাতে অপেক্ষা করতে থাকি আমরা বাংলাদেশ যাত্রার জন্য। জগদীশ বাবু মোবাইলে কথা বলে নানাজনের সাথে। ওপার থেকে মোবাইলে ফোন করে মহাজন কাদের মল্লিক। জানতে চায় কি অবস্থা আমার! বুকে সাহস রাখার পরামর্শ দেয়। রাত দুটোর দিকে ৫-জনে ১০-টি গরু নিয়ে রওয়ানা দেই বর্ডারের দিকে। আমাদের সাথে জগদীশ বাবুর লোক গণেশ আর নিরঞ্জন। তারা খাল পর্যন্ত এগিয়ে দেবে আমাদের। খালের কাছাকাছি আসতেই গণেশ একা এগিয়ে যায় সামনে। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে এখানে। মিনিট দশেক পর ফিরে এসে বলে - "আজ পার হওয়া যাবেনা। বর্ডার গরম। চলেন ফিরে যাই বাড়িতে"!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আধা ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসি আমরা বেপারীর বাড়িতে গরুসহ। জগদীশ বাবু মোবাইলে গালাগালি করে কাকে যেন। সম্ভবত যে দায়িত্ব নিয়েছিল বর্ডার সাফ রাখার তাকে। বাংলাদেশে কাদের মল্লিকের সাথেও কথা বলে মোবাইলে। একটা বড় কক্ষে ১০/১২ জনের জন্য পাতা বিছানায় ঘুমাতে দেয় আমাদের ৫-জনকে। গণেশ হেসে বলে - "তোমাদের আর কোন কাজ নাই। সারাদিন খাবা আর ঘুমাবা। আবার রাতে সব ঠিক থাকলে বর্ডারে যাবো"! সকাল ১০-টার দিকে ডেকে তুলে সবাইকে নাস্তা খাওয়ায় গণেশ। সাবধান করে দেয় আমরা যেন কেউ ঘরের বাইরে না যাই। রুমে লাগানো ছোট সেকেলে সাদাকালো টিভিতে ইন্ডিয়ান বাংলা ছবি দেখে, শেফালিকে মোবাইল করে, আর মাপা ভাত খেয়ে আবার রাত হয়। রাত ১-টার দিকে খবর আসে বর্ডারে যেতে হবে। আবার সজ্জিত করে গরু আনা হয় উঠোনে। আমাদের ৫-জনের হাতে তুলে দেয়া হয় ১০-টি সাদা বড় গরু।

:

কালকের নির্দিষ্ট স্থানে এলে গণেশ আর নিরঞ্জন এগিয়ে যায় সামনে। আমরা গাছের নিচে জঙ্গলের মধ্যে মশাদের গান শুনে অপেক্ষা করতে থাকি। রাত ২-টার দিকে গণেশ আর নিরঞ্জন ইশারা দেয় আমাদের সামনে এগুতে। খালের দুদিকে কাঁটাতারের বেড়া। কেবল খালটি খোলা জলস্রোতের কারণে। খালের উঁচু পাড় ভেঙে গরুসহ নিচে নামি আমরা। কিন্তু নামতে গিয়ে একটা গরু কি কারণে যেন পা মচকে উল্টে যায়। অন্ধকারে জলকাঁদাতে পড়ে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করে উল্টে পড়া গরুটি। নি:শব্দ গভীর রাতে সে আওয়াজ হয়তো শুনতে পায় অদূরের বিএসএফ জওয়ানরা। উজ্জ্বল টর্চের আলো ফেলে তারা দ্রুত এগিয়ে আসে সামনে কাঁটাতারের বেড়া ঘেষে। ৫-জনে ১০-টি গরু নিয়ে খালে নেমে আবার ওঠার চেষ্টা করতে করতে ওরা এগিয়ে আসে আমাদের খুব কাছাকাছি। হিন্দিতে চিৎকার করে "রুখো" শব্দে থামতে বলে আমাদের। কিন্তু আমাদের থামার কোন নির্দেশনা নেই। যেভাবেই হোক গরু নিয়ে এগুতেই হবে সামনে। আমরা তখন দুই দেশের নোম্যান্ডস ল্যান্ডে। পিচু ধাওয়া করতে করতে খালের জলে নামে বিএসএফ জওয়ানরা। আমাদের সবার পেছনে একটু দূরে থাকা ফরিদ শেখকে গরুসহ ধরে ফেলে ওরা। আমাদেরও থামতে আকাশে ব্লাঙ্ক ফায়ার করে ওরা। কিন্তু বাকি চারজনে এগিয়ে যাই ওদের আদেশ উপেক্ষা করে। আমরা যখন খাল পার হয়ে বাংলাদেশ অংশে ঢুকে পড়েছি প্রায়, তখন আমাদের লক্ষ করে ৪-রাউন্ড গুলি ছোড়ে ভারতীয় বিএসএফ জওয়ানরা।

:

গুলি খেয়ে আমার পেছনের কাল্টু দর্জি পড়ে যায় খালের জলে। বন্ধু হিসেবে তাকে তুলতে গেলে গুলি লাগে আমার ডান পায়ে। এবার খালের পাড়ে নুয়ে থাকা একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি আমি অন্ধকারে। কানে শুনতে পাই পেছনে ফরিদ শেখের আর্ত চিৎকার। তাকে পেটাচ্ছে ওরা রাইফেলের বাট দিয়ে। আমাদের ৮টি গরু বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে গেছে। কাল্টু দর্জির গরুদুটোও আমার গরু দুটোর কাছেই দাঁড়ানো। চারটে গরু নিয়ে আমাদের সাথের দুজনে নির্বিঘ্নে চলে গেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে। সম্ভবত কাদের মল্লিকের খাটালে পৌঁছেছে তারা এখন। বিএসএফ জওয়ানরা এবার ফিরে যাচ্ছে ফরিদ শেখ আর তার গরু নিয়ে তাদের ঘাটির দিকে। আমার পা দিয়ে রক্ত ঝড়তে অবিরত। গরু চারটে খালের এক কিনারে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। কাল্টু জলের মধ্যে মুখ থুমড়ে পড়ে আছে। সম্ভবত মারা গেছে সে। বন্ধু আমার সে! কিন্তু এখন বন্ধুর লাশ দেখার বা বহনের সময় নয়! এবার কি মনে করে যেন শেফালিকে ফোন দেই আমি। ফিসফিসিয়ে বলি - "তুমি কি খালের পাড়ে বড় তালগাছটার নিচে আসতে পারবা? গুলি লাগিছে আমার পায়ে। তোমার সাহায্য দরকার। তোমার বাবা কই? সে কি ঘরে"?

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

অন্ধকার ভেঙে আধা ঘন্টার মধ্যে শেফালি পৌঁছে যায় তালগাছতলায়! শেফালির কাঁধে ভর দিয়ে বলি - "চলো গরু চাইরটা লইয়া পালাইয়া যাই। এই গরু অন্তত ২-লাখ ট্যাকাতে বিক্রি করবার পারুম আমরা। তারপর তোমারে নিয়া ঘর বাঁধুম সেই ট্যাকাতে"। ভয় পেয়ে শেফালি বলে - "কিন্তু কাদের মল্লিক যদি টের পায়"? "তার আগেই তুমি তোমার বাবাকে নিয়া সফিক মাঝির খাটালে বেইচা দিবা এই গরু। আমি চইলা যামু কাদের মল্লিকের বাড়ি খালি হাতে। তারে গিয়া কমু কাল্টুর মইরা যাওনের কথা"। ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর শেফালির খুব পছন্দ হয় আমার কথা। পরিকল্পনা মোতাবেক চার গরু নিয়ে পশ্চিম দিকে নিজ বাড়ির পথে দ্রুত হাঁটতে থাকে শেফালি। আর আমি রক্তঝরা পা নিয়ে খোড়াতে খোড়াতে এগুতে থাকি কাদের মল্লিকের বাড়ির দিকে। খালের জলে তখন ভাসছে বন্ধু কাল্টু দর্জির মৃতদেহ!

:

ভোরের আলো ফোটার আগেই দূরের মাইকে ভোরের আজানের ধ্বনি শুনতে পাই "আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম"! কিন্তু আজান দেয়া এই মুয়াজ্জিন কি জানে, দুদেশের এ কাঁটাতারের সীমান্তে আমাদের রাত কিভাবে কেটেছিল? ভোরের আলো ফোটাতে পাখিরা কিচির মিচির শব্দ করছে। আমি কুয়াশাঘেরা অন্ধকারে একাকি খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছি কাদের মল্লিকের বাড়ির পথে। গরুর ব্যাপারে তাকে একটা বানানো মিথ্যে গল্প বলতে হবে। আমার পা থেকে অবিরাম টকটকে লাল রক্ত ঝরছে, তার দিকে একদম নজর নেই আমার! ভোরের কুয়াশায় আমার মাথায় এখন কেবল গরু আর শেফালির চিন্তা!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

দ্বিধাথরথর চিত্তে দু:খবাতাসের অমরাবতীর তীরে

:

সমুদ্র আমার আজন্ম ভাললাগা আর ভালবাসা। যখন যে দেশে গিয়েছি, সমুদ্র না দেখে ফিরিনি আমি। ভুটান গিয়ে সুমদ্র না পেয়ে প্রায়শ ঝরণার জলে পা ডুবিয়ে রাখতাম। বিকেলে বসে থাকতাম ঝরণা নদীর শোঁশোঁ শব্দের মাঝে! ঢাকা থেকে এক মুক্তমনা প্রবাসী বন্ধুকে নিয়ে সমুদ্র মোহনায় বেড়াতে এসে বিকেলে নৌকো ভ্রমণে বের হলাম দুজনে। ইচ্ছে সমুদ্র ঘুরবো দুজনে! পূর্ব পরিচিত নৌকো বলে মাঝির ভূমিকাতে নিজেই 'এ্যাক্ট' করছিলাম কৈশোরিক আনন্দ স্কুলের হৃদয়ঘন অভিজ্ঞতায়। সমুদ্র বাতাসে জীবনের আনন্দঝড়ে পাল ওড়াবো যখন এক অনুপম ভাললাগায়! ঠিক তখনই আকস্মিক একটা স্পিডবোটে ৩-জঙ্গী এসে একদম কাছাকাছি হলো আমাদের আমাদের জলবোটের। কিছু বোঝার আগেই, এ সুখ-সফেন জলবাতাসে ৩-জনেই চাপাতি দিয়ে এলোপাথারি কোঁপাতে শুরু করলো আমাদের দুজনকে, কালবিলম্ব না করে হাঙরপূর্ণ এ কাফন-সমুদ্রে। কুঁপিয়ে ওরা ফেলে দিল আমাদের দুজনকে জলে ওদের বিশেষ ধর্মীয় স্লোগান তুলে। সাগরের শীতের স্বচ্ছ নীলজল টকটকে লাল রক্তে একাকার করে আমরা ক্রমে দুজনে নিমজ্জিত হতে থাকলাম অতলান্ত দু:খময় মৃত্যু জলতলে। প্রথম দুতিনটে চাপাতির আঘাতে খুব ব্যথা পেয়েছিলাম আমি। তারপর কি হলো, তা আর মনে নেই আমার! হয়তো মৃত্যু যখন খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন শুনেছি মানুষ ব্যথা, যন্ত্রণা, কষ্ট, দুখানুভূমি অতিক্রম করে যায় এক অন্তত মহাকাশে! ক্রমে ভারী মাংসল রক্তাক্ত দেহ জলতলে ডুবতে থাকলে, নিচের উষ্ণ প্রবাহমান জলস্রোত দ্রুত ভাসিয়ে নিতে থাকলো আমাদের দুজনকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের খুব গভীর তলদেশীয় খাদে। এক জলবায়বীয় অনুভবহীন মৃত জগতে ভাসতে থাকলাম আমরা, যতক্ষণ না পৌঁছলাম এক বিশেষ মহাসাগরীয় গভীর ঘূর্ণন খাদের ভেতর!

:

একটা অভাবিত সুন্দরের মাঝে আলোকোজ্জ্বল এক ঝলমলে জলদেশের গভীরে পড়তেই আবার প্রাণতায় ফিরে গেলাম আমরা। সম্ভবত ঐ সুন্দর জলস্পর্শে আমাদের চাপাতির কোপগুলো আর যন্ত্রণা সব নিমিশেই বিলিন হয়ে গেল এক ।লৌকিক ফুলেল ঘ্রাণতায়। কোন ব্যথা, যন্ত্রণা, কষ্ট কিছুই রইলোনা আর আমাদের দুজনের। বরং এক শিল্পিত জীবনের শেষ প্রপঞ্চের সমাপিত আনন্দের মত, এক স্নিগ্ধ ঘ্রাণতায় ভেসে যেতে থাকলাম আমরা প্রাঞ্জল অসিমতার মাঝে। জীবন প্রগাঢ়তায় সুখবৃষ্টির এক সুন্দরী লীলাবতীর ধুসরতার ডাকে, এগিয়ে যেতে থাকলাম আমরা সামনে এক বিশাল বৈকুণ্ঠের মাঠ পেরিয়ে। আহ! কি বিস্ময় ! এ মাঠে চেনা-অচেনা অগণিত মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এক বিশেষ ভঙ্গীতে। কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ বই পড়ছে, কেই হাঁটছে, আবার কেউ স্লোগাল তুলছে সত্য ন্যায্যতা আর মুক্তির বিহবলতায়। বাব্বাহ, এখানেও!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

খুব কাছে গিয়ে জীবন্ত এসব মানুষদের স্পর্শ করতে চাইলাম আমরা দুজনে। কিন্তু ওরা মননের এক বিশেষ অনুরণনীয় ভাষায় বললো - "এটা সত্য আর সুন্দরের জন্যে কথা বলে জীবন দিয়েছে যারা, তাদের অমরাবতী। তোমরাও নীতো আর নির্বাচিত হয়েছো এ জগতে। মানবীয় সভ্যতার বিষাদে পুড়ে, প্রেমজ দেহ লীন হয়ে, অনন্ত সুখে ভাসবে তোমরা এ অমরাবতীর মায়ামৃগ অমর সুমদ্র তীরে। তাই আমাদের মাঝে নিজের পছন্দমত যায়গা দেখে দাঁড়িয়ে যাও তোমরা। নতুন দ্বিতীয় সুখস্তরে নীত হওয়ার আগ পর্যন্ত, এ অমরাবতীতে থাকবে তোমরা আমাদের সাথেই। কাউকে স্পর্শ করতে পারবেনা কেউ এখানে। যাতে অন্যের সুখ কেউ বিনষ্ট করতে না পারে এ প্রান্তরে। এ জগত হচ্ছে সুখময় প্রজ্ঞাশীল জ্ঞানময়ী ভালবাসার ফুলেল বাগান!

:

চারদিকে তাকিয়ে প্রথম প্রেমের পৌষালী কৈশোরিক ছেলেবেলার সুখ খোঁজার মত এ অমরাবতীর তীরে মাঠময় হাস্নাহেনার জলঘ্রাণে হাঁটতে থাকলাম আমরা এক অনুপম বিষাদ-আ্নন্দে! আহ! কত মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে কত-শত বিশেষ ভঙ্গীমায়! সক্রেটিস, জর্দানো ব্রুনো, মিশরীয় নব্য প্লেটোবাদী দার্শনিক হাইপেশিয়া, নিকোলাস্ কোপের্নিকাস্, হুমায়ুন আজাদ, জন অ্যান্ডারসন, হুগো, সভেৎলানা, হেক্টর অভালস, এজে আয়ের, অ্যালান বাদিও, বোদলেয়ার, গ্যালিলিও, জুলিয়ান বেগ্গিনি, মিখাইল বাকুনিন, সিমোন দ্য বোভোয়ার, জেরেমি বেন্থাম, সাইমন ব্ল্যাকবার্ন, ইরন ব্রুক, রুডল্ফ কার্নাপ, জেসন আরন, উলভেরিন, ফরেস্ট জে একারম্যান, ডগলাস অ্যাডামস, জর্জ আমাডু, কিংসলি আমিস, শেঠ অ্যাণ্ড্রুজ আরো কতজন! সবার নাম কি জানি আমি এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে! আর তাদের হিসেব কি আমি জানি সবটা! কজনকেই বা চিনি আমি! কেউ মাঘের শীত কুয়াশায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে, কেউবা কপালে হাত তুলে সূর্যক্ষরতা নিরোধের চেষ্টায়। আবার কেউবা প্রিয় লেখকের বই পড়ছে এক বিশেষ রূপ-সুষমায়। যেন জীবন বোধের ধুসর দিনরাত্রির দ্বিধাহীন সমর্পিত এক বাঙ্ময় কল্পধারা!

:

বিস্ময়কর এ স্বপ্ন জল-বাতাস মাঠে সৃষ্ট জগতের প্রতারিত, বঞ্চিত, দন্ডিত মানুষগুলো নিজ সত্যকে দৃঢ়তায় আঁকড়ে আছে এ অমরাবতীর তীরে। মিথ্যুক শাসক আর ধর্মান্ধতায় নিমজ্জিত শঠ মানুষশূন্য এ বিশুদ্ধ জীবনের গোলাভরা সোনামুখি ধানের ঘ্রাণে এগুতে থাকি আমি আরো সামনে। আমার প্রিয় কবি, যার কবিতা নিয়ে চর্চা আর গবেষণা করেছিলাম আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, হ্যাঁ সেই দেবোপম একিলিসের গোঁড়ালির মত ভঙ্গুর সকাল-সন্ধ্যার কষ্টজীবনের শাশ্বতীর কবি সুধীন্দ্রনাথকে খুঁজে পেলাম এ অমরাবতীতে! পাশে দাঁড়ানোর আগে মনে প্রশ্ন জাগলো আমার - 'আচ্ছা কবিরা কি সব ভবিষ্যত স্রষ্টা হয়? না হলে কিভাবে কবি আমায় তরুণ বয়সেই শুনিয়েছিন"!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

"শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া
স্বর্ণ সুযোগে লুকোচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি;
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে;
বিরহ বিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালী শেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা!
:
একদা এমনই বাদলশেষের রাতে
মনে হয় যেন শত জনমের আগে-
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;
একটি পণের অমিত প্রগল্ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধরে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়েরে পথ ছেড়ে দিল অকাতরে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এবং এক দ্বিধাথরথর চিত্তে বিভূতিভুষণ, অমীয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দোপাধ্যায় আর সুধীন্দ্রনাথের মত সাতটি অমরাবতীর মাঝে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি এ অসীমতার সুখ প্রপঞ্চের তীরে। এসব প্রিয় মানুষদের দিকে তাকিয়ে, জীবনের আনন্দ অক্ষরেখার জোয়ারে প্লাবিত শব্দমালারা উড়তে থাকলো আমাদের চারদিকে, সুখের ডুবজলে খুঁজে মরা ধুসর প্রান্তরের দু:খবাতাসের মত! এ অমরাবতীর সবুজ ক্ষেতপ্রান্তরে কোন চাষা কৃষাণের নিঃশব্দতা নেই একটুও! রোদ দুপুরের অপরাহ্ণ এসে নিষাদ নদীর খাড়িতে গিয়ে মিশে গেছে কোন দূর দিগন্তে! মিসরীর মমির গহ্বরগৃলো হারিয়ে গেছে অনাদি অকূল দিগন্তে! সুন্দর সময়ের শতাব্দী তীক্ষ্ণ ভালবাসার সুখ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে মহাজাগতিক যুগের শেষ লগ্নে! ময়ূর পেখমের শিশির জলে প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতিকথারা হাঁটছে অসীম নিশব্দে কৃষাণের বিবর্ণ লাঙলফলার মতো। ফুলপাখিরা অন্ধকার ঢিবিকে আলোকিত করে রাখছে নিরুৎকীর্ণ মাঠ ফসলি সোনালী ধানের ঘ্রাণে। জীবন মাঠের খড়ের স্তূপের মাঝে ঘুমিয়ে আছে আলোকিত জোনাকিরা। যারা গান গায় জলপিপি করে শেষ বিকেলের টুপটাপ জলের সুরে। কষ্টময় পৃথিবীর ভ্রান্তিবিলাসে নচিকেতা প্রচেতার গানে ভরে যায় অনিমেষ চাহনি। স্মৃতিদগ্ধ জনমানবের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হতে থাকে পুরো অমরাবতী! আমরা জীবন আঁচলভরে তুলতে থাকি এ ভাললাগার সুখময়তাকে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

গান শোনা ব্যাঙাচির জীবন : "আমার আল্লা নবীজির নাম দেলে করো ঠাই"

:

বরিশাল শহরে ২০-শতকের একটা জমি ছিল আমার পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত। তা বিক্রি করে ২০০৯-সনে ঢাকার অভিজাত এলাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছি আমি। বছর সাতেক আগে মায়ের সূত্রে প্রাপ্ত নানাবাড়ির জমি বিক্রি করে কিনেছি জাপানি একটা নুতন মডেলের গাড়ি। সেই হিসেবে গাঁয়ের নদীতে সাঁতার কেটে বড় হওয়া, জল-কাদা ভেঙে খালি পায়ে স্কুলে যাওয়া, জেলে কৃষাণদের সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করা আমি এখন ঢাকার অভিজাত বাসিন্দা বলা-ই যেতে পারে। এখন কদাচিৎ গাঁয়ে যাই আমি। তবে গাঁয়ের মানুষদের সাথে ঢাকা কখনো দেখা হলে, সমাদর করে বাসায় আসতে বলি তাদের। কেউ এলে স্ত্রী খুব যত্ন করে বিরিয়ানি রান্না করে খাওয়ায় গাঁয়ের মানুষদের। গাঁয়ে ফিরে তারা প্রশংসা করে আমার গুণী স্ত্রীর। কিংবা ন্যুনতম কাউকে চা পান করাই ফুটপাথের চা দোকানে! এ রীতি আমরা পেয়েছি মাতৃক আর পৈত্রিকসূত্রে!

:

আমার গাঁয়ের 'সকিনা'কে ঢাকার ফুটপাতে ভিক্ষা করতে দেখি আমি প্রায়ই। আগে দেখতাম ফার্মগেট ওভারব্রিজের ওপরে! তারপর গুলশান আজাদ মসজিদের কাছে। একদিন সংসদ ভবনের সামনে দেখি এক পঙ্গু পুরুষকে কোলে করে ভিক্ষা করছে ফুটপাতে। গাড়ি থামিয়ে ঠাট্টার ছলে বলি - "কি খবর সকিনা! তোমার কোলে আবার কে এই ব্যাডা"? লজ্জিত হয়ে সকিনা বলে - "আপনের নতুন দুলাভাই ভাইজান"! জানতে চাই নতুন দুলাভাইর পরিচয়। মুখ টিপে সকিনা হেসে বলে - "ওনার বাড়ি কিশোরগইনজো। আমাগো বস্তিতে থাহে একেলা, বউ মইরা গেছে তেনার। আমার চেহারা দেইখা পছন্দ করেছে উনি খুউব! তাই কাজি ডাইকা হাজার টেকা মহরানায় কাবিন কইরা বিয়া বইছি উনার কাছে। এহন এক ঘরে থাহি, আর একলগে ভিক্ষা করি। উনি সুরা দিয়া ভালা গান গাইতে পারে, তাই ইনকাম ভাল হইতাছে ভাইজান"। সকিনার কথায় আপ্লুত হই আমি। আমাকে একদিন বিএনপি বস্তিতে সকিনা আর কেফাতুল্লার সংসার দেখতে আমন্ত্রণ জানায় আমার এককালের গাঁয়ের প্রতিবেশী সকিনা বিবি। "যাবো একদিন বেড়াতে" বলে বিদায় নেই আমি সকিনা থেকে।

:

সকিনা আমার প্রায় সমবয়সি। আমার গাঁয়ে তাদের দরিদ্র জেলে পরিবারের বাড়ি ছিল। নদী ভাঙনের কারণে পরিবারটি দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়। ওর জেলে বাবা ঢাকা আসে রিক্সা চালাতে পুরো পরিবার নিয়ে। কিশোরি সকিনাকে বিয়ে দেয় ঢাকার এক রাজমিস্ত্রীর সাথে। দুবছর পর ছাড়াছাড়ি হয় তাদের। কারণ ঐ ব্যাটার নাকি আগের বউ আছে! তারপর নাকি বছর বছর অনেক স্বামী বদল করেছে নি:সন্তান সকিনা। এক সময় জানতে পারি বাসাবাড়িতে কাজ ছেড়ে নানাস্থানে ভিক্ষা করে সে। এ পেশা নাকি তুলনামূলক সহজ, আর ভাল ইনকাম ভিক্ষাবৃত্তিতে। দুয়েকবার ঈদের লম্বা বন্ধে পুরণো গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিল সকিনা। একবার তালুকদার বাড়িতে ঈদের জাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে মানুষের চাপে মারাত্মক আ্হত হয়েছিল নিজ গ্রামেই এই সকিনা। মানুষহীন আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে তাকে থাকতে বলেছিলাম কবার কিন্তু সে বলেছিল, এসব ভাল লাগেনা তার, ভিক্ষাটাই ভাল কাজ তার কাছে। তাই বার বার ফিরে এসেছিল ঢাকার ফুটপাতে! বছর ভিত্তিক স্বামী বদলালেও, এ পেশা বদলায়নি সকিনা আজো!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ড্রাইভার হিসেবে গাড়ি ড্রাইভ করছি আমি পুরাতন এয়ারপোর্ট বায়ে রেখে। আর পেছনের সিটে যাত্রী হিসেবে সকিনা আর তার স্বামী কেফাতুল্লা। সকিনা আবদার করে ড্রাইভার ভাইজানকে কেফাতের গান শোনাতে। তাই কেফাতুল্লা গলা টানটান করে গান ধরে পেছনে হেলান দিয়ে সিটে তার খোড়া পা দুটো তুলে - "আমার আল্লা নবীজির নাম দেলে করো ঠাই, আমার আল্লা নবীজির নাম"।

:

ঢাকার মহাসামুদ্রিক যানজটে আটকে সূর্য ঢলা দুপুরবেলার হারিয়ে যাওয়া গল্পের মত নচিকেতা, অঞ্জন, কবির, শচীনদেব, সুনীধি চৌহান, এআর রেহমান, সনু নিগম, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, কৈলাশ খের, শ্রেয়া ঘোষাল আর মৌসুমি ভৌমিকের "ফিদা" এই আমি গভীর একনিষ্ঠতায় শুনতে থাকি কেফাতুল্লার গাওয়া- "আমার আল্লা নবীজির নাম দেলে করো ঠাই, আমার আল্লা নবীজির নাম"। পেছনে বসা দু'যাত্রী নিয়ে নিষ্পাপ বিশুদ্ধ জীবনের পুষ্পিত ঘ্রাণময়তার সুখ নিংড়ে এগিয়ে যেতে থাকি আমি এক প্রাণময় জীবনের দিকে। যে জীবনে বেঁচে থাকি আমি, সকিনা, কেফাতুল্লা আরো কত দুখী মানুষেরা! এবং এ বেঁচে থাকার আত্মবোধের স্বাপ্নিক দ্বীপে সাঁতরাতে থাকি আমি চমকপ্রদ সুখ ঘ্রাণতার খোঁজে অনেকদূর!

:

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ঢলে তা হারিয়ে যায় সাংসদ লেকের টলটলে কাকচক্ষু নীল জলে। এবার দরজা খুলে পরম যত্নে সাংসদ ফুটপাথে নামিয়ে দেই সকিনা কেফাতুল্লাকে। কিন্তু নেমেই কেফাত কালবিলম্ব না করে গান ধরে - "আমার আল্লা নবীজির নাম দেলে করো ঠাই, আমার আল্লা নবীজির নাম"! স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে গাড়ি ঘুরিয়ে দেই বিজয় সরণির দিকে। কিন্তু নচিকেতা, অঞ্জন, কবির, শচীনদেব, সুনীধি, এআর রেহমান, সনু নিগম, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, কৈলাশ খের, শ্রেয়া ঘোষাল আর মৌসুমি ভৌমিকের সব সুর হারিয়ে গিয়ে আমার কানে কেবল বাজতে থাকে কেফাতের গাওয়া - "আমার আল্লা নবীজির নাম দেলে করো ঠাই, আমার আল্লা নবীজির নাম"!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

অতিন্দ্রিলা, অর্নব আর ক্যারিবিয়ান সাগরে জলসমাধির গল্প!

:

ঋণাত্মক জীবন আর সহস্রাব্দের নিষ্ঠুরতার মাঝেই ড. অর্নব ঢাকা থাকে কর্মসূত্রে অনেকদিন। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এ মানুষটি শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের পর থেকেই নিয়মিত অফিস করতে পারেনা। কাজ ফেলে প্রায়ই শাহবাগে বসে যান প্রজন্ম চত্বরের তরুণদের সাথে অনুক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত যন্ত্রণাকে ঢাকতে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্লোগান 'জয়বাংলা'কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্লোগান ঘোষণার দাবিতে অর্নব রিট করেছিলো হাইকোর্টে, যা অদ্যাবধি শুনানি করতে পারেননি সপ্তপদি আমলাতান্ত্রিকতায়। চাকুরিসূত্রে ডেপুটেশনে রিয়াদ দূতাবাসে পোস্টিং থাকাকালে, শক্তিশালি বাংলাদেশি জামাতি লবিং সৌদি সরকারের কাছে "নাস্তিক অর্নবকে" শিরোচ্ছেদের ব্যবস্থা করে "ধর্মদ্রোহী" আখ্যা দিয়ে। হয়তো শিরোচ্ছেদ হয়েই যেত অর্নবের। যদি না এক তরুণ সৌদি কবি "আল শায়েরের" সাথে গভীর বন্ধুত্ব না থাকতো অর্নবের। প্রকাশ্যে শিরোচ্ছেদের আদেশের কথা শুনে মানবতাবাদি এ কবি ও গায়ক ওপর মহলে তদবির করে অর্নবকে রক্ষা করে এই শর্তে যে, তাকে সরাসরি চলে যেতে হবে বাংলাদেশে। সৌদি থাকতে পারবে না সে। অবশেষে নিজের নতুন কেনা নিশান সানি গাড়ি রাস্তায় পার্কিংয়ে রেখে, চাবিটি পকেটে ভরে, বিনা পাসপোর্টে এক কাপড়েই সৌদি পুলিশ সৌদিয়া এয়ারের জ্যাম্বো জেটে তুলে দেয় অর্নবকে। ৭-ঘন্টা পর ঢাকা পৌঁছে তন্দ্রাচ্ছন্ন শ্রান্ত আঁখিসহ অভিশপ্ত এক ভয়াল জীবনকে পেছনে ফেলে।

;

বহুদিন লেখালেখি করলেও ফেসবুকে প্রথম প্রবেশ করে শাহবাগি জলজ জ্বলন্ত আত্মজ চেতনায়। নিয়মিত পোস্ট দেয়া শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ধর্ম, দর্শন আর বৈশ্বিক জীবনবোধের কতকথা নিয়ে। ধর্মবিষয়ক যৌক্তিক পোস্ট নিয়ে মুক্তচিন্তার এ মানুষটির সাথে আত্মীয়, বন্ধু, সহযোগী আর কলিগদের যেমন দূরত্ব সৃষ্টি হয় ধর্ম বিশ্বাসের কারণে, তেমনি ব্লগ আর ফেসবুকে জুটে যায় অনেক শুভাকাঙ্খী আর শুভার্থীদের। বাংলাদেশ আর পৃথিবীর বহু এলাকা থেকে বাঙালিরা তাকে নানাবিধ অভিনন্দন জানায় বিবিধ প্রপঞ্চে। জঙ্গী ধর্মান্ধরা তাকে বিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় জল শুকিয়ে যাওয়া কুয়োয় বেঁচে থাকা ব্যাঙাচির জীবনচক্রের মত। চিন্তার শৃঙ্খলিত খাঁচায় বন্দি নির্লোভ আর সাহসী এ মানুষটি সব ভ্রুকুটি ঝেড়ে ফেলে তার কর্মটি করতেই থাকে, আকাশ রাজ্যে মেঘেদের নির্দিষ্ট জীবনময়তার মতই।

;

কর্মযজ্ঞের মাঝেও প্রত্যহ ১৬/১৭ ঘন্টা পড়ালেখা আর পোস্ট, ব্লগে নানাবিধ যৌক্তিক আর বিজ্ঞানমনস্ক পোস্ট অব্যাহত রাখে অর্নব। অনেক বন্ধুর মাঝে যুক্তরাষ্ট্রে পরিজায়ি বাঙালি অতন্দ্রিলার সাথে ফেসবুকে পরিচয় হয় অর্নবের। যে কর্মসূত্রে এখন বসবাস করে মায়ামি বিচে। পোস্টের যুক্তি প্রতিযুক্তিতে অর্নবের প্রতি বৃষ্টির মতো মুষলধারে ঝরে পরে অতন্দ্রিলা! বাইরের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও দিনে একবার অন্তত ইনবক্সে কথা না বলে থাকতে পারেনা দুজনে তারা। প্রজ্ঞাময়ি এ মেয়েটির চেতনায় একসময় স্নাত হয় অর্নব। নানা ব্যস্ততা আর ক্লান্তির মাঝেও সে আতঙ্কের আঁচলে ইনবক্সে প্রত্যাশা করে অতন্দ্রিলাকে। দুজন স্বতত্র ধর্ম পরিবারে জন্ম নিলেও, শিক্ষায় তাদের ধর্মকে ঝেড়ে আধুনিক মানুষে পরিণত করে, তাই হয়তো বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর হয় তাদের মাঝে ক্রমশ। মাঝে মাঝে খুনসুটি হলেও, দু'জনে আবার ইনবক্সে কথা বলে বৃষ্টিভেজা স্টেশনের ধুলোবতী পাগলের মাদকতায়।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এক সময় কথা হয় অর্নব ১-মাসের ছুটি নিয়ে মায়ামি যাবে অতন্দ্রিলার সাথে দেখা করতে। সরকারি দফতরের ছুটি, বিদেশে যাওয়ার অনুমোদন, ভিসা লাগানোসহ নানা ঝক্কির পর একদিন সত্যিই অর্নব উঠে বসে আমিরাতের ইকে এ-৩০০ বিমানের ইকো শ্রেণিতে। ঢাকা-দুবাই-মায়ামি ফ্লাইট প্রায় ২০-ঘন্টার জার্নি ট্রানজিটসহ। অতন্দ্রিলার জন্যে বাঙালি তাঁতের শাড়ি, যশোরের চিড়ুনি, হুমায়ুন আজাদের বই সমগ্র, পদ্মার ইলিশ ভাজা নেয় সাথে এক সময়ের গ্রামীণ বালক অর্নব। জানেনা সে যুক্তরাষ্ট্রীয় বাঙালি অভিবাসিরা কি ভালবাসে এখন! তবুও মার কাছে এসব উপহারের কথা শুনেছিল সে, তাই মার পছন্দকেই অর্নব অগ্রাধিকার দেয় জীয়ন কালের শেষ খুঁটি হিসেবে!

;

প্রায় ৫-ঘন্টা দুবাই ট্রানজিস্ট ডেস্কে থেকেও ক্লান্তিরা ঘায়েল করতে পারে না অর্নবকে! কারণ নেট ছাড়া মাঝে দু'বার মোবাইলে কল দিয়ে খবর নিয়েছিল অতন্দ্রিলা এ নৈ:শব্দ দুবাই দুপুরে। বলেছে - চিন্তা করোনা, ১৩-ঘন্টা পরই নামবে তুমি Miami International (EMIA-MIA) Airport-এ। বেড়িয়েই দেখবে আমায় দাঁড়ানো এক্সিট গেটের সামনেই। এক সময় মায়ামির জন্য নির্ধারিত ফ্লাইটে উঠে বসে বিকেলে পরিজায়ি রঙিন পাখির স্বপ্নে। খুব ভোরেই ল্যান্ড করবে এ ফ্লাইট মায়ামি সামুদ্রিক বিচে উচ্ছ্বাসের শীতল জলভরা নদীতীরে।

;

বিমানজার্নি সবচেয়ে বোরিং আর ক্লান্তিকর লাগে ড. অর্নবের কাছে। ট্রেন, বাস, স্টিমারে হাঁটাচলা যায় সুন্দর করে! দেখা যায় মানুষ আর প্রকৃতিকে মনভরে। কিন্তু বিমান জার্নিতে বেশি হাঁটাচলা ছাড়াও একঘেয়ে লাগে অর্নবের কাছে, বিমানের বিশাল ডানা ঝাপটানো, আর মেঘের সমুদ্র ছাড়া আর কিই বা দেখার থাকে তখন? আর ফ্রিকোয়েন্ট জার্নি করে বলে সস্তা ইকোনো ক্লাসে টিকেট করতে হয় তাকে, যাতে চাপাচাপি খুব। ভাল করে গা এলিয়েও বসা যায়না বিজনেস ক্লাসের মত! তার মাঝে এয়ারপকেটে পরে বাম্পিং শুরু হলেতো কথাই নেই! ঠিক যেন ঝড়ো হাওয়ায় মেঘনায় ছোট ডিঙি নৌকো। ঝড়মড় করে ভেঙে পড়লো বলে!

;

মা অর্নবকে শিখিয়েছিল, বিমানে উঠেই একটি দোয়া পড়তে হয়, তাতে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বিমান। মা যখন হজ্জে গিয়েছিল অর্নবসহ, যখন ঢাকা ভার্সিটিতে পড়তো অর্নব! তখনো বারবার নিজে আর অর্নবকে দোয়া পড়িয়েছিলেন তিনি। অর্নব এখন যুক্তি আর প্রজ্ঞাকে তার মহাকাশীয় বিস্ময় মানে, তাই দোয়াটোয়ায় কোন কাজ হয় এটায় মন টানেনা তার। কারণ দেখেছে, সিঙ্গাপুর-বৃটিশ এয়ারে কোনা দোয়া না পড়লেও, তা তাদের টাইম সিডিউল, যাত্রা নির্বিঘ্ন রাখে। আর বাংলাদেশ বিমানে সব সময় দোয়াটোয়া পড়া হলেও, তাদের ফ্লাইট বিপর্যয় নিত্যদিনের ঘটনা। তার চেয়ে ক্যানভাসের পিছনে উঁকিমারা আকাশটা দেখতে চেষ্টা করে অর্নব। বিশাল ডানার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে দেখা যাচ্ছে রঙিন মেঘের ভেলা। আচ্ছা এ মেঘের মাঝে কি মা আর পরীরা উড়ে বেড়ায়! মা বলেছিল, মৃত্যুর পর মেঘের মাঝে তাকে খুঁজে পাবে অর্নব!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

মহাকালের পথচলায় এক সময় চিন্তায় পড়ে যায় অর্নব, কিভাবে চিনবে সে অতন্দ্রিলাকে? যার ছবিও দেখেনি সে মনের অতিন্দ্রিয় আলেয়ার আলোতে। অর্নবের আইকিউ যাচাইয়ের জন্যে অতন্দ্রিলা ছবি দেয়নি তাকে। বলেছিল, দেখি চিনতে পারো কিনা আমায় আমার লেখা আর ফোনের কণ্ঠ শুনে। চমকপ্রদ রেজাল্ট করা অথচ গ্রামীণ সাধারণ পরিবারে বড় হওয়া অর্নবের আইকিউ কি মায়ামি কন্যার কাছে মার খাবে? ত্রাস, হুমকি, অবসাদ, মৃত্যুচেতনা আর নিঃসঙ্গতা তাকে কি অর্থব মানবে পরিণত করেছে এখন? কাল-স্রোত-ইচ্ছা-স্বপ্নরা কি অর্নবকে জাগাবে না আর দ্রোহের আগুনে? জলছবিরা কি ম্রিয়মান থাকবে জীবন ছায়াতলে!

;

এসব বিনম্র চিন্তনে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে দক্ষিণের বিনম্র ঝাঁঝালো বাতাসের জালে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানেনা সে! ঝিমিয়ে পড়া সময়টা বড্ড ক্লান্তিতে হামাগুড়ি দেয় তার সিটে। আকস্মিক প্রবল ঝাঁকুনিয়ে ঘুম ভেঙে যায় তার বুকফাটা যন্ত্রণাকাতর অস্থিরতায়। ক্রুরা ত্রস্তে সিটবেল্ট বাঁধতে বলে সকল যাত্রীকে। অন্ধকার কেটে কেটে দুবাই থেকে বিমান আফ্রিকা রুটে সরাসরি চলে এসেছে ক্যারিবিয়ান সাগরের আকাশে। আর মাত্র ঘন্টা খানেক পরেই মায়ামিতে ল্যান্ড করার কথা এ বিশাল আকাশ যানের। কিন্তু হঠাৎ উঠে আসা ক্যারিবিয় প্রবল সামুদ্রিক ঝড় আকস্মিক আঘাত হেনে বাম ডানাকে উল্টে দিয়েছে আধুনিক আমিরাত ভ্যাসেলকে। প্রবল ঘুর্ণিবার্তা, ঝড়ো বাতাস, অন্ধকার রাতের ত্রাসে সব যাত্রীরা দাঁড়িয়ে যায় সিট থেকে। মেঘনায় সাঁতার কাটা, জীবন যুদ্ধে সর্বত্র জিতে আসা সদ্য ঘুম ভাঙা অর্নব বুঝে উঠতে পারেনা কি করবে সে। অনেকবার অনেক দেশ ভ্রমণ করেছে সে কিন্তু এমন বিমুঢ়তায় সে আচ্ছন্ন হয়নি কখনো। এটা কি সাধারণ এয়ার পকেট নাকি ভয়াবহ কিছু!

;

একবার নিউজিল্যান্ড থেকে ফেরার পথে তার পাশের সিটের শেতাঙ্গ ভদ্রলোক হার্ট এ্যাটাক করে তার বুকে লুটিয়ে পরে মারা যায় এক মিনিটেই। অপরিচিত এ অস্ট্রেলিয় নাগরিকের লাশ অনেকক্ষণ বুকে ধরে রাখে অর্নব। সেই সাহসী অর্নব করণীয় নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়ে লাইফ জ্যাকেট হাতে নিয়ে সমস্ত সৌরভ বিলিয়ে স্মৃতি হয়ে যাবে এখন? এক এয়ারহোস্টেস এসে পরিয়ে দেয় তাকে জ্যাকেটটি। কিন্তু কি এক অভিমানে তার জ্যাকেট পড়তে ইচ্ছে হয়না আর! প্রাণতায় মগ্ন থাকতে ইচ্ছে করেনা আর জীবনের এসব গল্পে। প্রবল ঝাঁকুনিতে কাত হয় যায় সকল যাত্রীরা, কেবিন কম্পার্মেন্টে রাখা জিনিসপত্র পরতে থাকে নিচে একটার পর অন্যটা। ধর্মজানা অর্নবের মুখে মার শেখানো বিমান রক্ষার ত্রাণ দোয়াটা চলে আসে, কিন্তু দোয়া পড়েনা না সে। কেন যেন ক্যারিবিয়ান সাগরে নিমজ্জিত হয়ে তার মরে যেতে ইচ্ছে করে শেষ রাতের নৈ:শব্দের নীল জলরাশিতে। অতন্দ্রিলা ফেসবুকে একদিন তার সাগর সমাধি চেয়েছিল! কেন নয় তা আজই এ কারিবিয় উত্তাল জলতলে? উদ্দেশ্যহীন বিষন্ন ছায়াতে কেন যেন হাঁটতে চাইছে না অর্নব! সকল যাত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে সে মুত্যুকে হাতছানি দিয়ে ডাকে! স্বাদ নিতে ইচ্ছে করে সমুদ্র মৃত্যুর!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বিষাদের এ নৃত্যনাট্য মাঝে হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে অর্নবের হাতে। অপেক্ষারত সময়কে ভেঙে অতন্ত্রিলা কল দিয়েছে মায়ামি বিচ থেকে। কি বলবে অর্নব এখন অতন্ত্রলিকে! মানুষ রূপী প্রেতাত্মা সে এখন মৃত্যু দুয়ারে? মেঘের উপর আঁকা নক্সা ছিঁড়ে এ জলসমুদ্রে মারা যাবে এখন তাই বলবে ভালবাসার অতন্ত্রিলাকে? অসংখ্য শৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলায় ক্লেদাক্ত ট্রাজিক জীবন অতন্দ্রিলার। যাকে ভালবেসে ঢাকা থেকে নিয়েছিল ভিন্নধর্মী হয়েও, সে প্রতারণা করেছিল অতন্দ্রিলার সাথে। ভালবাসেনি একটুও তাকে। কেবল যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ভালবাসার নাটক করেছিল মুসলিম ছেলেটি। কিন্তু পৌঁছার পরও ঠোকর দিয়ে হৃদপিন্ড ছিঁড়ে দিয়েছিল অতন্দ্রিলার! ব্যবচ্ছেদ করেছিল তার হৃদমননের! কেবল যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসি হতেই অতন্দ্রিলার বাণিজ্যিক ফিয়ান্সে সেজেছিল এ ভন্ডপ্রেমিক। তাই অতন্দ্রিলার জন্যে মনের কোনে এক কষ্ট জমোট বেঁধেছিল অর্নবের। সে আর কোন নতুন কষ্টের ভাগি করতে চায়না অতন্দ্রিলাকে। অর্নবের এ বিপর্যের কথা শুনে কি করতে পারবে অতন্ত্রিলা কেবল নিজেকে দু:খগুলোকে মিয়ামি বাতাসে ওড়ানো ছাড়া? তার চেয়ে অতন্দ্রিলা কোনদিন না জানুক অর্নবকে। বোবা আলো ভর করে ওর জীবন আর ক্লেদাক্ত না হোক। তাই এ সোমত্ত রাত্তিরে অকথ্য ক্লান্তিতে বিপরীত চিন্তা করে অর্নব! এ বিমানটি যেন সত্যি পড়ে যায় এ জলরাক্ষসের মাঝে তাই কামনা করতে থাকে সে মনেপ্রাণে।"অহরৎ" বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যেমন মৃত্যু কামনা করে মরে যায় নিজে নিজে, অর্নবও আজ মৃত্যুকে বরণ করবে এ ক্যারিবীয় সাগর মাঝে!

:

সকল যাত্রীর আর্তচিৎকার মাঝে সর্বনাশা মারিজুয়ানার নেশার মত প্রবল ঝড়ো বাতাসে বাম ডানাটি ছিঁড়ে নেয় বিমানের। মুহূর্তে মৃত্তিকা, জল, আকাশ, বজ্র, ঘুর্ণি একজোট হয়ে চোখের পলকে দ্বিখণ্ডিত করে বিমানটিকে। সব যাত্রীর আর্তনাদ আর শব্দসন্ত্রাস আকাশ বাতাস আর জলকল্লোলে একাকার করে ক্যারিবিয় সাগরের ধোয়াশাময় অন্ধকার আকাশ। অর্নব নিঝুম সন্ধ্যায় শ্বাশত স্নিগ্ধতার মত মহাকাশে ঝাঁপ দেয় গুলিবিদ্ধ পাখির মত! নিচের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হতেও অতন্ত্রিলার জন্যে আনা তাঁত শাড়িটা হাতে ধরে রাখে অর্নব! মৃত্যুপ পর যেখানে অতন্ত্রিলা তাকে নিজ হাতে জলতলে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল একদিন। নির্লিপ্ত অর্নব ক্লেদাক্ত পাতাঝরা বৃক্ষের মত সাদা ফেনিল জলোচ্ছাসের দিকে এগুতে থাকে ঝড়োবাতাসের উড়েচলা পাতার মতো। প্রচণ্ড দমকা বাতাস আর অগাধ জনকল্লোলে অর্নবের অবোধ দুঃখবোধগুলো লিন হতে থাকে ক্রমশ। বজ্র, বৃষ্টি আর বিমানের ধ্বংসাবশেষের সাথে এক প্রশান্তির মৃত্যুর দিকে সে এগিয়েই যায় ক্রমান্বয়ে। তারপর এ সমুদ্র জলরাক্ষস, আর এ ঝড়ো বাতাস অনর্বকে ছুঁয়ে প্রচন্ড রোষে ছুটতে থাকে মায়ামি বিচের দিকে। প্রবাহমান প্রবল বাতাস কি অর্নবের হাতে ধরা তাঁত শাড়িটাও উড়িয়ে নিয়ে যায় সাথে করে? অতন্ত্রিলার মৃন্ময় শরীর কি ছুঁতে পারবে এ ঘুর্ণী বাতাস আর ঐ তাঁত শাড়ি? নষ্ট বীজের ভ্রুণ থেকে জেগে ওঠা এ জলকেলি কি ভেঙে পড়বে মায়ামি বিচে দ্রোহি ঢেউ হয়ে? দু;খকষ্ট ভয় ত্রাস ক্লেদহীন এক মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় ভরে অর্নব হিজল ফুলের মত ডুবতে থাকে ক্যারবীয় জলরাক্ষসময় ঢেউয়ের মাঝে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ডা: চন্দ্রাবতী এবং ড. ভ্লাদিমির ইলিচের শেষ দেখা!

ড. ভ্লাদিমির ইলিচ আন্দ্রিউসা এই মাত্র 'এফিডেভিট' করে তার বাঙালি নাম পরিবর্তন করলেন। এখন তার সংক্ষিপ্ত নাম ভ.ই. আন্দ্রিউসা। এ নামটি তার খুবই পছন্দের। কারণ বছর পাঁচেক আগে যখন তিনি রাশিয়া যান প্যাট্রিক লুমুম্বা ফ্রেন্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয় PhD করতে, তখন তার 'রিচার্স উপদেষ্টা' ছিলেন এই প্রফেসর ভ্লাদিমির ইলিচ আন্দ্রিউসা। ভাষিক জগতে মহাসমুদ্র ছিলেন তিনি। নিজে বাঙালি না হয়েও জানতেন বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি, উড়িয়া, মৈথিলি, অহমিয়া, আর্মেনীয়, আন্দামানি আর কতো ভাষা। হাতে কলমে তিনি বুঝিয়ে দিতেন বাঙলা বর্ণ প্রতীকের সাথে হিন্দি বা উড়িয়ার সাদৃশ্য কিভাবে কিংবা রুশ, উজবেক, কাজাক, আর আর্মিনিয় ভাষার বর্ণ, শব্দ, আর উচ্চারণ তত্ত্বে কি অপূর্ব ঐকতান! রাশিয়াতে তখন রুশ ছাড়াও যেসব ভাষা প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে চেচেন, চুভাশ, কাল্মিক, কাবার্দিয়ান, কোমি, মারি, মর্দ্ভিন, অসেতীয়, তাতার, তুভিন, উদমুর্ত, ইয়াকুত, আভার, বুরিয়াত, বাশকির ইত্যাদি। এসব ভাষার সাথে পরিচয় করান তিনি বাঙালি ড. আন্দ্রিউসাকে। ভাষা ছাড়াও এ অধ্যাপক তার সকল ছাত্রকে ঘুরিয়ে দেখান উত্তর থেকে দক্ষিণে তুন্দ্রা, তৈগা, স্তেপ ও অর্ধ-ঊষর রুশ মরুভূমি। তা ছাড়া বরফাচ্ছান্ন আর্কটিক ও সাইবেরিও শৈত্যপ্রবাহ। ভলগা, লেনা, দানিয়ুব, তৈগা, ইখটস্ক নদীতে নৌবিহারে যান শিক্ষার্থীদের নিয়ে। নারী সঙ্গহীন জীবন কাটান একা বরফাচ্ছিত কাঠের ঘরে একান্ত একাকি।

তার কাছেই ড. আন্দ্রিউসা বুঝতে পারেন সত্যিই ভাষাও এক জটিল অথচ আনন্দের উপাখ্যান মানুষের জীবনের মতই। ৩-বছর বাইরে থেকে দেশে ফিরে এসেছেন দুটো জিনিস ত্যাগ করে ড. আন্দ্রিউসা। এক নিজের নাম, দুই নিজের পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম। আর নাম পরিত্যাগের আরেকটি প্রধান কারণ তার নাম মোহাম্মদ, গনেশ, মাইকেল শুনে কেউ যেন তাকে ধার্মিক না ভেবে বসে। তাই নাম আন্দ্রিউসা, যাতে কেউ বুঝতে না পারে সে মূলত কোন ধার্মিক না নধার্মিক!

ঢাকায় ফিরে পুরণো সরকারি দাসত্বের কর্মটি ছাড়াও নতুন যে কাজটি ড. আন্দ্রিউসা শুরু করে তা হচ্ছে ফেসবুকে লেখালেখি। ৩-বছর বিদেশে থাকাকালিন এটায় নেশাসক্ত হয়েছে সে। সরকারি সকল কর্তারা যখন লোভনীয় একটা যুৎসই পোস্টিংয়ের জন্য ইঁদুর দৌঁড়ে লিপ্ত থাকে সারাক্ষণ, তখন ড. আন্দ্রিউসা এসবের কোন খোঁজই রাখেননা বলতে গেলে, সে তার ভূবনে উড়তে থাকে একাকি আকাশচারী গাঙচিল হয়ে।

এর মাঝে ফেসবুক সূত্রে পরিচয় হয় ডা: নিবুলা চন্দ্রাবতীর সাথে। কয়েক বছর আগে ডাক্তারি পাস করে মাত্র বিসিএস দিলো ডা: চন্দ্রাবতী, আপাতত কাজ করছে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে 'ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার' হিসেবে। ইনবক্সে অভাবিত শব্দঝঙ্কারের মুগ্ধ সৌন্দর্যমন্ডিত কথার ছলে, দু'জনের শেকলের পর শেকল চুরমার করা ঝনঝনে শব্দে জীবনের প্রেমময়তা বাজে প্রায়ই। আদিগন্ত ভাললাগার ফুলেল সুভাস তা নানা ছন্দে প্রকাশিত হয় ইনিয়ে বিনিয়ে বিবিধ প্রপঞ্চে! নিজের দু:খগুলোকে ভাগাভাগি করে তারা কিন্তু কেবলই ক্ষীয়মান নক্ষত্রের মতই। কেউ কাউকে দেখিনি এমনকি কথাও বলেনি কখনো এ ঢাকা শহরে থাকলেও। আন্দ্রিউসা কখনোবা জানতে চেয়েছিল ঠিকানা কিংবা যোগাযোগ মাধ্যম কিন্তু চন্দ্রাবতি ধূসর মাটিতে তা গড়িয়ে দিয়েছে নানা কথার ছলে, জল পড়ে যা ভিজে গলে গেছে এক সময় অজান্তিকে। তাই কেবল ফেসবুক জগৎ ছাড়া আর কেউ চেনেনা কাউকে! দেখাও হয়নি কখনো!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এভাবে প্রায় প্রত্যহ কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা হয় ড. আন্দ্রিউসা আর ডা: চন্দ্রাবতীর সাথে। ধর্ম, দর্শন, বিশ্ব, মহাকাশ, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য কিছুই বাদ যায়না তাদের আলোচ্য বিষয় থেকে। দুজনের ফেলে আসা জীবনের বিজন অশ্রুবিন্দুর গান আর জীবন দ্রোহের কথাও বাদ যায়না কখনো। জীবন পিঠে অতীত প্রেমের চাবুকের দাগ তারা প্রায়শই আর্যশ্লোকের মত আওড়াতে থাকে জান্তে কিংবা অজান্তে। ড. আন্দ্রিউসার সাধ জাগে কখনো ডা: চন্দ্রাবতির সাথে দেখা করার! নিভৃতে কথা বলার! যৌথ চাষাবাদে কোন মানব ফসল ফলাবার। কিন্তু কেন যেন হয়ে ওঠে না এসব। অজানা কারণে শেকলে বাঁধা পড়ে থাকে দুর্বিনীত আশা বনের বৃক্ষকূল। বিস্ময়কর ব্যাপার এতদিন তারা অনেক কথা বলেছে ইনবক্সে ঘটার পর ঘন্টা, সাজিয়েছে শব্দমালার অসিম সমুদ্র! কিন্তু কেউ দেখেনি কাউকে এমনকি ছবিতেও নয়। এ এক পরম বিস্ময় একুশের ফেসবুক জগতে!

:

কখনো ড. আন্দ্রিউসা প্রবোধ দেয় নিজেকে এভাবে, সভ্যতার সমস্ত শিল্পকলার মাঝে অধরা অপ্সরা-রাই সম্ভবত মানুষের কল্পনার ছন্দে ছন্দায়িত সবচেয়ে বেশি। আর তাই ডা: চন্দ্রাবতি এভাবেই থাকনা অধরা হিসেবে, ধানসিঁড়ির হারিয়ে যাওয়া সুতীব্র জলঢেউ আর কল্পনার উচ্ছ্বাস হয়ে ! কিন্তু তারপরো প্রায়শই তার মাথায় এক হৃদয় টাটানো ঝড়ো বাতাস খেলা করতে থাকে সারাক্ষণ। কি মনে করে যেন, একদিন প্লান করে ডা: চন্দ্রাবতিকে না জানিয়েই তার হাসপাতালে আকস্মিক গিয়ে দাঁড়াবে সে। এবং বলবে - "হ্যালো ডক্টর চন্দ্রা, আমিই আন্দ্রিউসা! তোমার সারারাত কেড়ে নেয়া সেই নরাধম বন্ধু"! এসব কুচিন্তা মাথায় ভেতর কিলবিল খেলা করে সকাল বিকেল মাঝ বয়েসি ড. আন্দ্রিউসার।

সঙ্গোপনে খবর নিয়ে যখন ইমারজেন্সিতে ডিউটি আছে ডা: চন্দ্রাবতির, এমন এক রৌদ-দুপুরে সত্যিই হাসপাতালে যেতে বের হয় সে। পরস্পর হৃদয়ের কিসব শব্দাবলি ভাগ করবে, এমন দৃশ্যাবলি কল্পনায় কখন ঢাকার যানজট পেড়িয়ে চলে যায় স্কয়ারের একদম কাছাকাছি। কিন্তু রাজপথের আকস্মিকতা সব ঘিরে ধরে মাঝবয়েসি ড. আন্দ্রিউসাকে। সড়ক সন্ত্রাসী আর RAB'র ক্রোস ফায়ারের বানানো গল্পের বদলে, এবার সত্যি ঘটনা ঘটে যায় স্কয়ারের ব্যস্ততম মীরপুর সড়কে। আর তাতে গুলিবিদ্ধ হয় ক'জন সন্ত্রাসি আর নীরিহ পথচারি ড. আন্দ্রিউসা। বুকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলি লাগে তাঁর। অপরাজেয় ধীবরেরা যেমন প্রচণ্ড ঝড়ে নিমজ্জিত হয় পর্বতাকৃতির ঢেউয়ের মাঝে, তেমনি দেহের জ্যোৎস্না হারিয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে এ সড়কে আন্দ্রিউসা। অচেনা পথিকরা ধরাধরি করে তাকে নিয়ে যায় স্কয়ার ইমারজেন্সিতে, যেখানে ডা: চদ্রাবতি ডিউটিরত অবস্থা শেষে ড্রেস পাল্টে মুক্ত হয়ে বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন! অঘোর অন্ধকার জীবনের অমাবশ্যায় ড. আন্দ্রিউসা চাঁদ, নক্ষত্র আর তারার মাঝে ভাসতে থাকে স্বজনহীন ছুটে চলা অনাথ নক্ষত্রের মত! এটা কি মানুষের প্রাক-মৃত্যুর লক্ষণ!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ডা: চন্দ্রা যখন বেড়োয় ইমারজেন্সী গেট দিয়ে, তার পাশ দিয়েই ড. আদ্রিউসার অবচেতন দেহ ট্রলিতে ঠেলে নিয়ে যায় হাসপাতাল কর্মচারীরা। তখন আকাশ অন্ধকার করে অঝোর বৃষ্টি নামে পৃথিবী জুড়ে। কিন্তু নিস্তেজ চেতনাহীন ড. আন্দ্রিউসাকে কি চিনতে পারে ডা: চন্দ্রাবতী? সে কি একবার ফিরে আসবে ইমারজেন্সীতে, যেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি লড়ছে তার প্রিয় বন্ধু! ড. আন্দ্রিউসা কি বেঁচে উঠবেন? সে কি হারিয়ে যাবে চন্দ্রাবতীকে না দেখেই? চন্দ্রাবতী কি চলে যাবেন এখন আন্দ্রিউসাকে ফেলেই? এভাবেই কি এ ফেসবুক গল্পের ইতি ঘটবে? জীবনের এই সব নিভৃত কুহক কি স্কয়ার ইমারজেন্সিতে নিভে যাবে আজই? দিগন্তের নীল জোৎস্নারা কি উঠবে না আর বাড়ির ছাদে? গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর বিষের মতো ড. আন্দ্রিউসার জীবন ক্লেদাক্ত হবে আজই? ডা: চন্দ্রাবতি কি লগইন করে ইনবক্সের অপেক্ষায় বসে থাকবে তার ফেসবুক বন্ধুর? সে কি এখনই চলে যাবে এ বৃষ্টিস্নাত দুপুরে তার বন্ধুর কপালে হাত না রেখেই?

উবারে কল দিয়ে স্কয়ার হাসপাতাল করিডোরে অঝোর বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ডা: চন্দ্রাবতী। আর ভেতরে ইমারজেন্সি বেডে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে শ্বাস টানার চেষ্টারত ড. ভ.ই. আদ্রিউসা!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

রক্ত পালকের দু:খপাখী কন্যার নাম পারুল!

:

গত ঈদের বন্ধে আমার প্রত্যন্ত গাঁয়ে ছুটি কাটানোর পর ঢাকায় ফিরবো বলে নদীর ঘাটের লঞ্চস্টেশনে এসে মাথা ঘুরে গেল আমার। লঞ্চঘাট শ' শ' মানুষে লোকে লোকারণ্য। আমার গাঁয়ের অন্তত ১০০-ছেলে মেয়ে লঞ্চঘাটে এসেছে ঢাকা ফিরতে। যারা অনেকেই কাজ করে ঢাকার পোশাক শিল্পে। ঘাটে বিদায় জানাতে এসেছে মা-বাবাসহ স্বজনরা। রাঙাবালির লঞ্চে আগেই 'কেবিন' করা ছিল আমার। তাই ঘাটে ভিড়লে কেবল অন্য সবার লঞ্চে ওঠার প্রতিযোগিতা দেখতে থাকি আমি পাশের হিজল গাছে হেলান দিয়ে। কিন্তু আমার প্রতিবেশী ১৪/১৫ বছরের 'পারুল'কে বিদায় জানাতে এসে, তার মা-বাবা মেয়েকে জড়িয়ে কান্না করতে থাকে অনবরত। দরিদ্রের ঘরে জন্ম নেয়া সুন্দরী কিশোরী পারুলও চোখ ভিজিয়ে শেষ যাত্রী হিসেবে মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে লঞ্চে পা-রাখে তার ঢাকার কর্মস্থলে যেতে। তারপরো মা বলে, "ঢাকা পৌঁছেই ফোন করিস মা"! দরিদ্র এ ঘরে এমন ফুটফুটে চেহারার পারুলকে দেখে বিমোহিত হই আমি! কিন্তু ততক্ষণে লঞ্চে তিল ধারণ তথা পা রাখার যায়গা নেই একটুও!

:

আমি কেবিনে ঢুকেও পারুলকে বসার যায়গা খুঁজতে দেখি বিশাল লোকারণ্য ডেকে। আমি একা কেবিনে, না হলে পারুলকে ডেকে আমার কেবিনে এ রাতের জন্যে বসতে বলতাম। এখন ডাকলে টিনএজ মেয়েটাও ভুল বুঝতে পারে কিংবা ডেকে অবস্থানকারী আমার গাঁয়ের পরিচিত অন্য মানুষেরাও। পরের স্টপেজে আরো মানুষ উঠবে এ দ্বিতল লঞ্চে, তা চিন্তনে মানবিক বোধে পারুলকে ডেকে বলি, "তুমি কি বসবে আমার কেবিনে"? হেসে পারুল বলে, "না আঙ্কেল। আমি আপনার কেবিনের বারান্দার চেয়ারটাতেই সারারাত বসে যেতে পারবো, যদি আপনি আমায় বসতে পারমিশন দেন এখানে"! "কেন দেবনা পারুল"! এ কথা বলে দরজা খুলে কেবিনের সামনের ব্যালকনিতে চেয়ারটা বের করে দেই পারুলকে। রাতে টিফিন কেরিয়ার খুলে আমার বাড়ি থেকে দেয়া প্রায় সব খাবার দিয়ে দেই পারুলকেও। ওর সাথের আরো ৩-৪ মেয়ে ভাগ করে খায় ঐ খাবার। এর মধ্যে যায়গা না পেয়ে আরো ৩-মেয়ে পারুলের পাশে বসেছে বারান্দার ফ্লোরে। অনেক রাত অবধি গল্প করি ওদের সাথে ওদের চাকরি, বেতন, ঘরভাড়া এসব নিয়ে। বড় নদীতে লঞ্চ ঢুকলে বারান্দার প্রবল ঠান্ডা বাতাসে জবু-থবু হলে কেবিনের কম্বলটি দিয়ে দেই ওদের, যেন চার জনে ঢেকে বসতে পারে শরীর খোলা বাতাসে।

:

ভোর ছটায় ঘুম ভাঙলে পারুলসহ কাউকেই আর দেখিনা বারান্দায়। ভোর ৪-টায় নাকি লঞ্চ পৌঁছেছিল ঢাকার ঘাটে। সম্ভবত ওরা সবাই নেমে গেছে তখনই। কম্বলটা চেয়ারের উপর ভাঁজ করা। ব্যাগ গুছিয়ে ১০-মিনিটের মাথায় নামতে গিয়ে দেখি কেবিন ছাড়া পুরো ডেকই বলতে গেলে খালি। তখনো ঢাকার সড়কগুলোতে খুব কম মানুষের ভীড়, তাই বারিধারার ফ্লাটে পৌছতে সময় লাগে না আমার খুব একটা।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

পরদিন ফোন পাই গ্রাম থেকে পারুলের বাবার। সে বাজারের একটা দোকান থেকে ফোন করে বলছে - "গতকাল একই লঞ্চে পারুল গেছে ঢাকাতে। আমার কেবিনের সামনে চেয়ারে বসা ছিল সারারাত। রাতে তাকে খাবার দিয়েছি, এ কথাও সে শুনেছে পারুলের অন্য ৩-পরিচিত মেয়ের কাছে ফোন করে। কিন্তু পারুল লঞ্চ থেকে নামার পর আর তার ভাড়া বাসাতে পৌঁছেনি বা যোগ দেয়নি কাজে"! শুনে কিছুটা চিন্তিত হলাম আমি। অফিসে বিজি থাকার পরও, গাঁয়ের বাজারে ফোন করে পারুলের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ঠিকানা নিলাম তার পিতা রজ্জব আলী থেকে। দুপুরে জরুরী কাজ ফেলে গুলশানের গার্মেন্টসে গিয়ে হাজির হলাম পারুলের খোঁজে। পরিচয় পেয়ে ভেতরে ঢুকতে দিলো গার্ড আমায়। ম্যানেজার সব শুনে ডেকে আনলো পারুলের সাথে একই রুমে থাকে এমন ২-মেয়েকে। তারাও জানালো, ছুটির পর ফিরে আসেনি পারুল বাসা বা অফিসে। সারাদিন খুঁজে, গ্রামে ফোন করে রাত ৮-টার দিকে খুঁজে বের করলাম নতুন বাজার ছোট ভাড়াটে ঘরে আমার গাঁয়ের ঐ ৩-মেয়েকে, যারা সারারাত ছিল পারুলের সাথেই লঞ্চে। তারা জানালো, লঞ্চ থেকে নামার পর হাজারো মানুষের ভীড়ে কোন বাসে উঠতে না পেরে এলোমেলো যার-যার মত হাঁটতে থাকে তারা ভোর ৪-টার দিকে। পারুলও তখন কোন দিকে যেন চলে যায়। কারণ পারুল থাকতো অন্য এলাকায়, তাই তাদের সাথে আসেনি সে।

:

সব ঘটনা শুনে ভীষণ দুস্চিন্তা ভর করলো আমার মননে। মেয়েদের কাছে শোনা কথামত, তাদের ৩-জনকে সাথে নিয়ে কোতয়ালী থানায় পারুল নিখোঁজের একটা জিডি করি আমি ঐ রাতেই। ওর বাবা মাকে ফোনে জানাই সব ঘটনা। ফোনেই তারা হাউ-মাউ করে কাঁদতে থাকে ক্রমাগত। আমার কাছে আকুতি জানায় তার মেয়েকে খুঁজে বের করতে!

:

থানায় নিয়মিত যোগাযোগ করি ফোনে। আমার এক প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসমেট RAB-এ জব করছে, তারও হেলপ চাই পারুল উদ্ধারের কিন্তু কেউই কোন ভাল খবর দিতে পারেনা পারুলের ৪-দিনেও। খুব ভোরে সদরঘাট থেকে ফোন পাই ওর বাবার। তারা সদরঘাট নেমেছে লঞ্চ থেকে, এখন কিভাবে আমার বাসায় আসবে জানতে চায় আমার কাছে। ভোর ৫-টার এ অন্ধকারে আবার তারা কোথায় হারায় এ চিন্তনে, ঘুমচোখে ড্রাইভিং সিটে বসি পারুলের মা-বাবাকে আনতে। কিন্তু সদরঘাট পৌঁছে হাজারো মানুষের ভীড়ে গাড়ি রাখার কোন যায়গা পাইনা আমি। যে নম্বর থেকে ফোন এসেছিল, সে নাম্বারে ৩-বার ফোন করে দোকানিকে বুঝিয়ে বললে, ঘন্টা থেকে পাশে দাঁড়ানো পারুলের অচেনা বাবা-মাকে আমার ফোন দিলে বুঝতে পারি তারা আমার জন্যে ঐ দোকানের সামনেই অপেক্ষা করছে। দোকানিকে আমার অবস্থান বলে, এই ২-অচেনা গাঁয়ের মানুষ দুজনকে কাউকে দিয়ে আমার গাড়ির কাছে পাঠাতে বলি তাকে। বিনিময়ে ১০০-টাকা দেবো এমন কথাতে দোকানি নিজেই দোকান ফেলে ওদের নিয়ে আসে আমার কাছে ২-মিনিটের মাথায়। আমাকে দেখে গাড়ির দরজায়ই গলা জড়িয়ে কেঁদে ওঠে মেয়ে হারানো মা-বাবা। ওদের দুজনকে গাড়িতে বসিয়ে এই কাক-ডাকা ভোরেই হাজির হলাম কোতয়ালী থানায় আবার। আমার পরিচয় দিয়ে ঘটনা বলাতে 'ডিউটি অফিসার' ফাইল খুলে তাদের তৎপরতা দেখালেন কিন্তু এখনো কোন ট্রেস পাননি তারা এ কথাও জানালেন মুখ কালো করে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

গাঁয়ের পারুলের মা-বাবাকে নিয়ে বাসায় ফিরতে নটা বাজলো আমার। তাদের কান্নাকাটিতে আর অফিসে গেলাম না আমি। ঢাকায় পারুল আর তার বাবার পরিচিত ৩২-জনকে ফোন করলাম বিরতিহীনভাবে। পারুলের মা-বাবা আসার কথা শুনে আমার বাসায় তাদের পরিচিত ৩-জন এলেন, পারুলের খোঁজ ও তার মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিতে। থানা পুলিশ, ফোন, পারুলের মায়ের একটানা কান্নার কোরাস, তার বাবাসহ বিভিন্ন স্থানে গমন করলাম আমি পাক্কা ৫-দিন, আমার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে। কিন্তু পারুলের কোন খোঁজই করতে পারলো না কেউ এ ত্রি-ভুবনের। ৭-দিনের মাথায় মেয়েকে না পাওয়ার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলো পারুলের বাবা। কারণ তার একমাত্র দুধের গরুটি বাছুরসহ পাশের একজনকে দেখে রাখতে বলে এসেছিলেন এ কদিন। কিন্তু সেই লোক দক্ষিণের নদীতে মাছ ধরতে যাবে বলে, গরুর জন্যে পারুলের বাবাকে ফিরতে বলছে দেশে দেরী না করে। মা মেয়েকে ছাড়া ফিরতে না চাইলেও, বাবার চাপে অবশেষে এক শুক্রবার সন্ধ্যায় লঞ্চে তুলে দিতে গেলাম তাদের দক্ষিণগামী ঢাকার লঞ্চঘাটে।

:

ওরা না চাইলেও রাঙাবালির লঞ্চে দুজনকে ১৬০০-টাকায় কেবিন করে দিলাম আমি। রাতে খাওয়ার জন্য পাউরুটি, আপেল আর কলা দিলাম সাথে। হাতে দু-হাজার টাকাও দিলাম পারুলের বাবাকে। কিন্তু মেয়ে হারাণোর দু:খ ভোলাতে পারলাম না এ মা-বাবাকে কেবিন, আপেল, মিনারেল ওয়াটারের বোতল আর নগদ টাকা দিয়েও। কেবিন ছেড়ে দুজনেই লঞ্চের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে থাকলো আমার দিকে চেয়ে। হৃদয় মোচড় দিয়ে তিনটা হর্ন বাজিয়ে লঞ্চটি যেতে থাকলো পেছনের দিকে। পারুলের মায়ের দিকে তাকিয়ে, সুখের নাকে স্বর্ণালী নথ ঝুলে থাকো কিশোরীর ঘ্রাণে বেঁচে থাকতে দেখলাম পারুলকে আমি। পারুলের মা-বাবাকে নিয়ে লঞ্চটি এবার চলতে থাকে তার গন্তব্যে দ্রুত কিন্তু আমার মননের জলের বুকে রঙতুলি আঁকতে থাকে পারুলের কষ্ট বাতাস।

:

লম্বা শেষ সাইরেন বাজিয়ে উজ্জ্বল সার্চ লাইট জেলে লঞ্চ এগিয়ে যায় বুড়িগঙ্গা ছেড়ে পদ্মার দিকে! আমি অনাথ শিশুর মত তাকিয়ে থাকি লঞ্চটার দিকে। অনেক দূরে চলে যায় রাঙাবালির লঞ্চ কিন্তু অসহ্য সময়ের হলুদাভ গোধূলি প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি আমি অনন্তকাল এ লঞ্চঘাটে পারুলের জন্যে। ঘরে ফেরা ভুলে যাই আমি কিভাবে যেন! অনেক রাত অবধি বুড়িগঙ্গার নোংড়া কালোজলে নিস্ফল খুঁজি আমি পারুলকে। কিন্তু অপ্রাপ্তির এক অস্থির অবগাহনে রাতের আকাশে পাখা ঝাপটে উড়ে যায় শূন্য মেঘপাখিরা। উড়ন্ত পাখিদের পাখার শব্দে পারুলকে খুঁজে মরি নাক্ষত্রিক আকাশে! উড়ন্ত পাখিরা বিষাদের স্লোগান তুলে উড়ে যেতে যেতে রক্ত পালকের এক দু:খপাখি আকস্মিক ঝরে পড়ে বুড়িগঙ্গার এ কালো জলে, যার পালক উড়ে যাচ্ছে বিপরীত বাতাসে। দেহের রক্ত মিশে যাচ্ছে বিষাক্ত নদীর ক্লেদময় কালো জলে! এ পাখিটার নামই হয়তো 'পারুল' ছিল!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কম্বোডিয়ার "ক্রেয়াং" নারী, যৌন স্বাধীনতা যার সামাজিক অধিকার

:

৬-দিন কম্পোডিয়ার নমপেন ঘোরার পর ইচ্ছে হলো লাওস ও ভিয়েতনাম বর্ডারের কাছে "রাতানাকিরি" প্রদেশে ঘুরতে যাবো, যা মূলত রাজধানী থেকে ৫৮৮ কিমি দূরে। যেখানে "ক্রেটার লেক" নামে বিশ্বনন্দন এক লেক বিদ্যমান। ক্রেটার লেক ছাড়াও ঐ প্রদেশের বানলুং জেলার Kreung উপজাতি মেয়েদের বিশেষ জীবন ও স্বাধীনতার কথা শুনেছিলাম অনেক আগে। এবার তা নিজ চোখে দেখার প্রবল আগ্রহ জাগলো মনে। বিশ্বের সকল নারীদের মধ্যে সম্ভবত "ক্রেয়াং" মেয়েরা সবচেয়ে বেশি সম্মান ও স্বাধীনতা ভোগ করে, তারই মূলত খোঁজ নেয়া। "ক্রেয়াং" টিনএজ মেয়েদের যৌন স্বাধীনতা, ভবিষ্যত পুরুষকে বেছে নেয়া ও স্বাধীনভাবে বিয়ে করা কিংবা না করার বিষয়ে বিষদ আলোচনার আগে এ জনগোষ্ঠী সম্পর্ক একটু ধারণা নেয়া যাক!

:

স্থানীয় বিমানে রাতানাগিরি গিয়ে নানা উপায়ে পৌছঁলাম লাওস ও ভিয়েতনাম বর্ডার ঘেষা বানলুংয়ের কাচান, লাবানসিক, ইয়েকলোম, টান কামাল, Phum Muoy, Phum Pir, Phum Bei, Phum Buon, Laork, Naoung Tien, কালা গ্রামে। যেখানে মূলত খেমার ভাষিক অন্তত ১০/১২ হাজার "ক্রেয়াং" জনগোষ্ঠীর বসবাস। যারা অন্তত ৩০০ "ক্রেয়াং" পরিবারে বসবাস করে ওখানে। মূলত কৃষি কাজ করলেও কাজু উৎপাদন করা "ক্রেয়াং"দের অন্যতম আয়ের উৎস। বৃক্ষমাঝে মাচানের মত ঘরে খেমার কালচারের "ক্রেয়াং" মানুষদের জীবনযাত্রা বড়ই বিস্ময়কর।

:

"ক্রেয়াং"রাই বিশ্বে সম্ভবত একমাত্র জাতি, যারা তাদের মেয়েদের ১৩-বছর হলেই পূর্ণ যৌন স্বাধীনতা দেয়। বেছে নেয়ার সুযোগ দেয় মা-বাবা তার টিনএজ কুমারী কন্যাকে তার সেক্স পার্টনার খুঁজে নেয়ার। ৪-বছর এ সুযোগ পান সব "ক্রেয়াং" মেয়েরা। ১৩-১৭ বছর পর্যন্ত প্রত্যেক "ক্রেয়াং" মেয়েকে সকল "ক্রেয়াং" পরিবার দেয় এ সুযোগ। সামাজিক রীতি অনুসারে এ বয়সি কোন "ক্রেয়াং" মেয়ে রাতে তার মা বাবার সাথে এক ঘরে ঘুমাতে পারেনা। ১৩ বছর হলেই "ক্রেয়াং" পিতা তার কন্যার জন্য নিজ বাড়ির একটু অদূরে নিজ হাতে তৈরি করেন Love Hut বা "প্রেমের কুঁড়েঘর"! সাধারণত বাঁশ, কাঠ ও বৃক্ষপাতা দিয়ে ছোট এ ঘর তৈরি করেন পিতা।

:

ঘর তৈরির পর সারাদিন টিনএজ কন্যাটি মা-বাবার সাথে মাঠে বা বাগানে কাজ করলেও, রাতে খাবার শেষ করে "ক্রেয়াং" রীতি অনুসারে ১৩/১৪ বছরের মেয়েটিকে চলে যেতে হয় তার জন্য বানানো একান্ত Love Hut এ। সেখানে সে অপেক্ষা করতে থাকে কোন "ক্রেয়াং" ছেলের। যার সাথে সে কথা বলবে, ভাব বিনিময় করবে এবং ভাল লাগলে করবে সেক্স। সাধারণত মোহিত করার জন্য "ক্রেয়াং" ছেলেরা তারা কাংখিত "ক্রেয়াং" মেয়ের জন্য দিনে কিনে রাখে নানাবিধ উপহার সামগ্রী। যাতে টিনএজ মেয়েটি পছন্দ করে তাকে। পুরো ব্যাটারটা নির্ভর করে "ক্রেয়াং" মেয়েটির ইচ্ছের উপর। সে কোন "ক্রেয়াং" ছেলেকে পছন্দ করে তার ঘরে ঢুকতে দিতে পারে, তার সাথে গল্প বা সেক্স করার অমন্ত্রণ জানাতে পারে। কিংবা করতে পারে প্রত্যাখ্যান! যদি "ক্রেয়াং" মেয়েটি অপছন্দ বা "না" করে তবে "ক্রেয়াং" ছেলে কখনো ঢুকতে পারেনা "ক্রেয়াং" মেয়েটির একাকি ঘরে, কিংবা জোর করতে পারেনা মেয়ের সাথে কোন ছেলে। মা বাবা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, তার কন্যার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন ছেলে তার মেয়ের ঘরে ঢুকছে কিনা কিংবা "অন্য কিছু" করছে কিনা। মেয়েটি রাতে চিৎকার দিলে বা ভোরে কোন "অভিযোগ" করলে শাস্তি পেতে হয় ছেলেটিকে। ধর্ষণ বা রেপ প্রচলিত নেই "ক্রেয়াং" সমাজে। তাই পুরো বিষয়টি ঘটে ১০০% মেয়েটির সম্মতির উপর।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এভাবে অন্তত ৪-বছর love hut এ একাকি "প্রিমেন্টাল সেক্স" করে কাটায় "ক্রেয়াং" মেয়েরা। কোন বিবাহিত পুরুষ কখনো "ক্রেয়াং" কুমারি নারীর ঘরে ঢুকতে পারেনা। এ ৪-বছরে সে সুযোগ পায় তার সেক্সপার্টনার তথা ভবিষ্যত স্বামী খুঁজে নেয়ার। এ সময় ইচ্ছে করলে একশ কিংবা তার বেশি ছেলের সাথে শারিরীক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে "ক্রেয়াং" মেয়েটি। একাকি ঘরে অবস্থানকালে "ক্রেয়াং" মেয়েটি গাছপাতার ককটেল পাণীয়, নিজেদের তৈরি মদ পান করে। এমনকি মা বাবা মেয়েকে তার Love hut এ জন্মনিরোধক সামগ্রী রাখতে সহায়তা করে বা পরামর্শ দেয়। তারপরো যদি মেয়েটি প্রেগনেন্ট হয় এবং তাতে জন্ম নেয় কোন সন্তান, তাতে কোনই সমস্যা নেই "ক্রেয়াং" সমাজে। বরং মেয়েটির পছন্দ অনুসারে চুড়ান্ত পর্যায়ে যে ছেলের সাথে বিয়ে হয় ঐ "ক্রেয়াং" মেয়েটির, বিয়ের আগে জন্ম নেয়া সন্তানটি আইনত হবে তার এ স্বামীর সন্তান। আসলে সন্তানসহ তখন বিয়ে করতে হয় স্ত্রীকে।

:

নারীর ক্ষমতায়ন ও এতোসব সুবিধা আর কোন সমাজে আছে কিনা তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে রইলো আমার কাছে। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আমাকে ছাড়তে হলো বানলুংয়ের কাচান, লাবানসিক, ইয়েকলোম, টান কামাল গ্রাম। কারণ রাতে বহিরাগত বা বিদেশিদের অবস্থান করার সুযোগ নেই "ক্রেয়াং" গ্রামে। যেখানে তখন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে "ক্রেয়াং" টিনএজ নারীরা!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

একাত্তর, তাতিয়ানা, দিমিত্রি ও তার মায়ের গল্প !

:

পুঁজিবাদি রাশিয়াতে ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলনা আমার। কারণ আমি ভালবাসতাম সোভিয়েত ইউনিয়নকে। কিন্তু সরকারি একটা প্রোগ্রামে যেতে হলো আমাকে সরকারি কাজে। মস্কো থেকে অনেক দুরের শহর প্রায় ৪-ঘন্টার বিমানপথ মস্কো থেকে। পশ্চিম সাইবেরিয়ার ওমস্ক টমোস্কের মধ্যবর্তী শহর 'নভোসিবিরস্ক'। 'নভোসিবিরস্ক' ভাষা ইনস্টিটিউটে যোগদান করতে এসেছি বাংলাদেশের আন্তজার্তিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি হিসেবে। যেখানে পৃথিবীর চলমান এবং বিলুপ্ত সব ভাষা নিয়ে ৭-দিনের বিলুপ্ত ভাষা রক্ষা বিষয়ক সেমিনার। পৃথিবীর অনেক বিচিত্র ভাষাবিদের সাথে পরিচয় হলো অনুষ্ঠানে। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে পরিচয় হলো্ টমস্ক পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ ভাষা শিক্ষিকা তাতিয়ানা আলেক্সিভিচের সাথে। অল্প ইংরেজি জানে তাতিয়ানা। পরিচয়ের এক পর্যায়ে যখন জানলো যে, আমি বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষার প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি অনেক দূর থেকে, তখন আমার সাথে পরিচয়ে বেশ আগ্রহী হলো রুশ নীল চোখ আর সোনালী চুলের ছফুট লম্বা তাতিয়ানা।

:

এক পর্যায়ে জানতে চাইলো আমি ভারতের অংশ বাংলাদেশ, নাকি স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ? যে দেশটি ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা লাভ করেছিল পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে। আমি স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলাতে আমার অবস্থান শহর ইত্যাদি জানতে আগ্রহী হলো এ বিদেশিনি। ঢাকা শহরে আমার অবস্থান বলাতে তাতিয়ানা আবার জানতে চাইলো চিটাগং শহর কোথায় এবং আমি কখনো সেখানে গিয়েছি কিনা? হ্যাঁ-সূচক উত্তরে তাতিয়ানার চোখ ছলছল করে উঠলো এবার। আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম কি ব্যাপার তাতিয়ানা? তোমার চোখ অশ্রুময় কেন? চোখ মুছে প্রায় ৪৫-বছরের রুশ নারী তাতিয়ানা যা বললো তার মর্মকথা হচ্ছে-

:

১৯৭১ সনে তার কুড়ি বছরের একমাত্র ভাই 'দিমিত্রি ফিউদর' কাজ করতো সোভিয়েত নৌসেনা হিসেবে। ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করে নিরাপদ করার জন্যে সোভিয়েত মাইন সুইপার "ভ্লাদিভস্তক" এর নাবিক হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরে কাজ করতে আসে তার ভাই 'দিমিত্রি ফিউদর'। কিন্তু এখানে কাজ করার সময় সমুদ্রে একটা ভাসমান মাইন বিস্ফোরিত হলে, অন্য কজন নাবিকের সাথে তার ভাইও চট্টগ্রামে সমুদ্রে মারা যায়। যে খবর তারা পান প্রায় ১-মাস পর। ঐ ৮-জন নাবিকসহ তার ভাই 'দিমিত্রি'কেও চট্টগ্রাম সমুদ্র সৈকত এলাকায় সমাহিত করা হয়েছে। ১৯৭২ সনে তার ভাইর সমাধির একটা ছবি পাঠানো হয় তার মার কাছে সোভিয়েত সরকার থেকে। এখনো তার বৃদ্ধা মা তার ভাইর জন্যে কাঁদেন তার ছবি নিয়ে। তাতিয়ানা তখন ছোট ছিল বলে মার কাছে ঘটনাটি শুনেছে সে। বাবা মারা গেছে অনেক আগে। মা তাই একাই থাকে টমস্ক নদীর পাশের একটা দ্বীপে তাদের গ্রামের বাড়ি 'ওসত্রোভ ইনোভে'। সেখানেই তাদের বাড়ি আর একটা ছোট খামার আছে বাবার। ঐ খামারের আয় আর পেনশনে চলে মার জীবন। তাতিয়ানা বিয়ে করেছিল এক উজবেক পুরুষকে কিন্তু ডিভোর্স হয়েছে তার সাথে ৫/৬ বছর আগে। তাই একাই থাকে সে তার ১৫-বছরের একমাত্র কন্যা 'সভেতলেনা'কে নিয়ে পাশের টমস্ক শহরে। তবে ছুটি বা অবকাশে মার সাথে কাটান 'তাতিয়ানা' ও তার মেয়ে 'সভেতলেনা'।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমি চট্টগ্রাম কলেজে পড়তাম এবং পতেঙ্গা কর্ণফুলি মোহনায় ৮-সোভিয়েত শহীদের স্মৃতিশৌধ অনেকবার দেখেছি আমি এ কথা বলাতে, খুশিতে চিকচিক করলো তাতিয়ানার চোখ। এক পর্যা্য়ে বললো, আমার মা খুব খুশি হবে যদি তোমাকে দেখে আমার মা। কারণ ছেলের মৃত্যুর পর কোন বাংলাদেশি মানুষকে দেখেনি তাতিয়ানার মা। পরদিন রোববার থাকাতে নভোসিবরস্ক থেকে ট্রেনে চেপে প্রথম ওমস্ক তারপর টমস্ক পৌঁছলাম তাতিয়ানা ও তার মেয়ে সভেতলেনাকে নিয়ে। টমস্ক নদীর পানি তখন বরফজমা ছিলো বলে, বরফে চলে এমন এক বিশেষ গাড়িতে পৌঁছলাম 'ওসত্রোভ ইনোভে' গাঁয়ে, যেখানে দোতলা কাঠের বাড়িতে একাকি বাস করে তাতিয়ানার প্রায় ৮৫-বছরের বৃদ্ধা মা। তাতিয়ানা আগেই খবর দিয়েছিল তার মাকে আমার ব্যাপারে। তাই প্রচন্ড তুষারপাতের মাঝেও যখন আমরা নামলাম স্থানীয় গাড়ি থেকে, তখন পাকা সড়ক পর্যন্ত বৃদ্ধা এলেন চামড়ার ওভারকোট আর তুষার নিরোধক ছাতা নিয়ে। চারদিকে বরফে ঢাকা গাছপালা পাড় হয়ে আমরা যখন তাতিয়ানার মায়ের বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন মনে হলো, বরফ আবৃত একটা ইগলুতে ঢুকছি আমরা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই প্রশান্তিতে মন ভরে গেল আমার। ওক কাঠের আগুন জ্বালিয়ে মা গরম রেখেছে পুরো ঘর। আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে 'দিমিত্রি ফিউদর' দীর্ঘদিন পর ফিরেছে তার ঘরে!

:

তাতিয়ানা বুঝিয়ে বললো আমায়, তার মাকে যেন আমি বলি চট্টগ্রামে বেশ কবার তার ভাই দিমিত্রির কবর দেখেছি আমি। আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে ৩০-লাখ বাঙালির সাথে এই ৮-বিদেশীর প্রাণদানের জন্যে মন খারাপ হলো আমার। তুষারমত সাদা ধপধপে বরফঢাকা টমস্কের এ ঘরে মনে পড়লো অনেক আগে ৭২-সনে কোন এক পত্রিকায় [নাম না জানা] প্রকাশিত একটি পেপার কাটিং কেটে রেখেছিল আমার মৃত মুক্তিযোদ্ধা বাবা, যাতে তাদের **নামগুলো ছিল নিম্নরূপ** : [১] Aleksandar Ustanov [Александр], [২] Demyan Andripov [Демьян], [৩] Dimitri Feodor [Димитрий], [৪] Gerasim Istonov [Герасим], [৫] Gennady Lyov [Геннадий], [৬] Lavrenti Yuriy [Лаврентий], [৭] Igor Vladimir [Игорь] **এবং** [৮] Fyodor Irinei [Фёдор] **সম্ভবত তাদের স্মৃতিতেই মূলত পতেঙ্গা কর্নারে একটি স্মৃতিশৌধটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৭২-সনে।**

:

তাতিয়ানার কথামত তার মাকে বলি দিমিত্রির কথা। কিন্তু মায়ের ভাঁজপড়া ক্লেদময় জীবনের ভারে নুয়ে পড়া কাঁধে তার চোখের দিকে তাকাতে পারিনা আমি। ত্রিশ লাখ শহীদমাতার সাথে ফিউদরের মার ছেলের জন্যে দুখ-ধুলোয় লুটানো ভালবাসায় ক্লেদাক্ত হই আমি অন্ধকার বনে জেগে থাকা একাকি জোনাকির মতো। যে মা আঁকড়ে ধরে আছে ৫০-বছর আগে হারানো তার ছেলের স্মৃতি। মৃত ছেলের স্মৃতি নিয়ে এভাবে তুচ্ছতর বেঁচে থাকার মাঝে এক মহান মায়ের অশ্রুশিক্ত জলবিম্ব পান্ডুর মুখ থেকে চোখ নামাতে পারিনা আমি। ঐ ভাষাহীন মা আমাকে কিছুই বলতে পারেনা। কেবল হারানো জীবনের ফোঁটা-ফোঁটা হ্রেষাধ্বনি তার চোখ বেয়ে নামতে থাকে ছেলে হারানো প্রণয়ের প্রবল পীড়নে। ছেলের প্রতি মার ভালবাসার ব্যর্থ দ্বৈরথে পূর্ণতা পেয়ে আমি যেন নিজের নাম ভুলে 'দিমিত্রি ফিউদর' হয়ে পলকহীন চেয়ে থাকি তাতিয়ানার মার দিকে। দু:খাতুর জীবনচক্রের শোকাচ্ছন্ন ঘুণপোকার মত মা একবার দেয়ালে টানানো মৃত ফিউদরের ছবির দিকে, একবার আমার দিকে তাকায়। কষ্টকর জীবনের অন্তিম কফিনশয্যায় হরিণের অতলান্তচোখে ছেলেকে ফিরে পাওয়ার মত তাতিয়ানার মা এবার অশ্রুভেজা চোখে ধরা গলায় ডুকরে কেঁদে ওঠে - "ও মোয় সিন দমিত্রি। কাক ত্বি দোমা?" (ও আমার বাবা ফিউদর, কেমনে তুমি ঘরে ফিরলে)!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ধূসরিত ক্ষীয়মান চোখে চাহনীর এ মায়ের রক্তাভ কথা শুনে নিজের জলজীবনের পরিচয় ভুলে যাই আমি। বাংলাদেশের জলদাস গাঁয়ের নয় রুশীয় 'ওসত্রোভ ইনোভে' গাঁয়ের দিমিত্রি হয়ে যাই আমি যেন ক্ষণকালের জন্যে! উত্তরাধুনিক তুষারপাত কিংবা প্রেমময় পরাবাস্তব শীতল জলের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে জ্বর ওঠে আমার পুরো শরীরে! শুকনো আষাঢ় নয়, বর্ষাতি বৃষ্টিস্নাত তুষারপাতের মাঝে যেন এক দুখ-মা ঝাঁপটে ধরে আমায় তার হারানো সন্তান হিসেবে। প্রাক প্রসব মূহূর্তের গর্ভিনী মোষের কষ্টের মত একঝাঁক শ্বাসকষ্ট অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধরে আমায়। চারদিকে অবিশ্রান্ত সাদা তুষারপাতের মাঝেও লাল নীলের কোলাজ ভেসে ওঠে ভেজা চোখে। ফিউদরের মায়ের দিকে তাকিয়ে নানাবর্ণের মেঘের কাব্য লিখে যাই আমি মন বসন্তে। ঈশানের কোণে জমে থাকা অবচেতনের কালো মেঘেরা ঘিরে ধরে পুরো বাড়িটা যেন। যেখানে অলীক জলের শিহরণে কাঁপতে থাকি 'আমি', 'তাতিয়ানা', কন্যা 'সভেতলেনা' আর ৮৫-বছর বয়েসি 'ফিউদরের মা'! চারদিক অন্ধকার করে ঝরতে শুরু করে কান্নাঝরা শ্বেতশুভ্র তুষার! যা হয়তো অল্পক্ষণেই ঢেকে দেবে পুরো বাড়ি! যে বাড়িতে বায়াত্তর থেকে টানানো মৃত দিমিত্রি ফিউদরের স্মৃতিময় ছবি!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

জুলেখা ও তার ১১-প্রেমিকের দু:খের কোরাস গান !

:

নদীবেষ্টিত আমাদের দ্বীপটিতে অনেক ভাসমান বেদে নৌকো ছিল আমার কৈশোরে। যাদের কেউ নদীতে মাছ ধরে বিক্রি করতো স্থানীয় বাজারে বা নদী-তীরে। কেউ সাপ ধরতো আর সাপের খেলা দেখাতো জেলে-কিষাণ ঝি-বৌদের। অন্য একটা বেদে গ্রুপ চুড়ি-ফিতা বিক্রি করতো গাঁয়ের মেয়ে বধুঁদের কাছে। এবং বিস্ময়করভাবে বেদে পরিবারগুলো ছিল নারী কেন্দ্রিক। মানে প্রতিটি নৌকোর প্রধান ছিল 'একজন নারী'। মাছ ধরা, সাপের খেলা কিংবা চুড়ি বিক্রি সব কাজগুলোই করতো মুলত নারীরা। পুরুষরা কেবল তাদের সহযোগী ছিল। হাজারো বেদে নৌকো আজ যান্ত্রিক জীবন তাড়নায় বিলুপ্ত হলেও, এখনো শ'পাঁচেক বেদে বহর ঘুরে বেড়ায় মেঘনা অববাহিকায়। যারা প্রায়ই আমাদের দ্বীপগাঁয়ে নৌকো ভেড়ায় জীবনের সপ্তপদি চাহনিতে এখনো এখানে সেখানে।

:

বেদে নারীরা খুব সেজেগুজে থাকতো সব সময় এবং বেশ খোলামেলা শরীর ছিল রঙ ঝলমলে পোশাকে। আমাদের গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান সকল নারীরাই যখন মাথায় ঘোমটা দিয়ে রাস্তা চলতো কিংবা বোরখা পরতো কেউ কেউ, বেদে নারীরা তখন টকটকে লাল রঙ ঠোঁটে লাগিয়ে, কোমরে বিছা লাগিয়ে আর পেট দৃশ্যমান রেখে, গাঁয়ের পথে পথে হেঁটে বেড়াতো যখন তখন। স্কুলে যাওয়ার পথে এক ছিপছিটে কিশোরী বেদেকন্যার সাথে আমাদের প্রায় প্রতিদিন দেখা হতো। 'জুলেখা' নামের ১৪/১৫ বছরের এ কফি রঙা ছোট মেয়েটি একই সাথে সাপের খেলা দেখাতো, আর বিক্রি করতো সাপে 'না কামড়ানোর তাবিজ'। কখনো তার মা থাকতো সাথে, কখনো একাই দেখা মিলতো তার। একা পেলে আমাদের কিশোর বন্ধু-গ্রুপ নানা হাসিঠাট্টা করতাম তার সাথে। কখনো লজেন্স, আলতা কিংবা বিস্কিট জাতীয় কিছু কিনে দিতাম তাকে, তাতে গল্পে সময় দিতো জুলেখা। সম্ভবত আমরা ১১-বন্ধু তার 'গ্রুপ-প্রেমে' পরে যাই একদিন। সেও খুব হাসি তামাশা করে উপভোগ করতো আমাদের সব কজনের বন্ধুত্ব। ভালবাসার টানে বিনে পয়সায় সে তার নিজ হাতে আমাদের ১১-বন্ধুর বাহুতে 'তাবিজ' বেঁধে দিয়েছিল একদিন। নিজ 'তাবিজ' টেস্ট করাতে গোখড়ো ঘষে দিয়েছিল আমাদের প্রত্যেকের শরীরে কিন্তু কোন সাপ ভুলেও কামড় দেয়নি আমাদের কাউকে। বরং জিভ বের করে আদর করেছিল এই ১১-জনকে সম্ভবত জুলেখার পক্ষে কিংবা তার নির্দেশে।

:

একদিন আমাদের ১১-বন্ধুকে শোক সাগরে ভাসিয়ে জুলেয়া বিয়ে করলো অন্য নৌকোর বেদে পুরুষ 'বসন্ত'কে। সাঁওতাল-মুখো বসন্ত তার নিজের বেদে নৌকোয় মাছ ধরে সারাদিন। জুলেখার মা নগদ ৫,০০০ টাকা পেয়ে ঐ বেঢপ বসন্তের কাছে বিয়ে দেয় জুলেখাকে মুসলিম রীতিতে। এবং বিয়ের পরদিন যথারীতি মায়ের নৌকো ছেড়ে বসন্তের নৌকোতে স্থানান্তরিত হয় জুলেখা। ৩/৪ দিন জুলেখাকে না দেখে বুকের ব্যথা চেপে ১১-বন্ধু মিলে যাই জুলেখার মায়ের নৌকোতে। তিনি জিভ উল্টে তাচ্ছিল্য ভরে বলেন, "সোয়ামির সাথে জুলেখা চইলা গেছে ভাটির চরে মাছ ধরতে, সাপ-টাপ সব দিয়া গেছে আমারে। সাপের খেলা দেখাইবো না আর। তোমরা তার চিন্তা বাদ দিয়া স্কুলে যাও"! রাগে ইচ্ছে করে জুলেখার বেঁধে দেয়া তাবিজ ছুড়ে ফেলি মেঘনার ভরা জলে কিন্তু এক অবুঝ প্রেমের ঘ্রাণতায় হাতে বাঁধা তাবিজ ফেলতে পারিনা আমরা কেউই জুলেখার প্রেমজ বাতাসে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

প্রায় ৭/৮ মাস পর আকস্মিক একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চলতে দেখি জুলেখাকে। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ায় সে। লজ্জায় কিছুটা বিব্রত হয় জুলেখা। আগের সামান্য হালকা একটা সাপের ঝুড়ির বদলে, এখন ১৫/২০ কেজি ওজনের মাছ বহন করছে জুলেখা। তার মুখের লাল রঙের বদলে দুপুরের রোদে পোড়া ক্লান্তির ছাপ স্পষ্টতর। সম্মিলিতভাবে সবাই ধরে মাছের ঝুড়ি নামাই আমরা মাটিতে। বলি, "এতো মাছ নিয়া কই যাও তুমি, কেমন আছো জুলেখা"? মুখ কালো করে তামাটে রঙা জুলেখা বলে, "তোমরাতো আমারে বিয়া করলা না কেউ। কেবল মিথথা প্রেমের কতা কইলা। হের লাইগা বসন্তের লগে বিয়া বইলাম আমি। এখন মাছ ধরতে ধরতে, আর বাজারে বেঁচতে বেঁচতে জানডা ত্যাজপাতা আমার"। কথা বললে বলতে জুলেখার কপাল বেয়ে রক্ত পড়তে দেখলাম আমরা। চুলে হাত দিয়ে দেখি বড় রিটা জাতীয় মাছের কাটা ঢুকেছে আমাদের প্রাক্তন প্রেমিকা জুলেখার মাথায় বাঁশের ঝুড়ি ভেদ করে। হারিয়ে যাওয়া ভালবাসার প্রগাঢ়তায় জুলেখার মাথায় রক্তবন্ধের বাংলাপাতা ঘষে দেই ১১-জনে হাতাহাতি করে। ভারী মাছের ঝুড়ি বহন করি আমরা ভাগ করে বাজার পর্যন্ত। মাছ বিক্রি শেষে জুলেখাকে নিয়ে কলাপাতায় গুড়ের জিলাপি খেতে খেতে জানতে চাই আমি, "জুলেখা তোমার পেট ফুলা ক্যান? তোমার কি কোনো অসুখ হইছে"? ১৫ বছরের কিশোর প্রাক্তন গ্রুপ-প্রেমিকদের জবাবে লজ্জিত হয়ে জুলেখা বলে, "আমার বাচ্চা অইবো"। আমাদের বয়সি এ ১৫ বছরের মেয়েটির কিভাবে এখন বাচ্চা হবে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাইনা ১১-জনের আমাদের কেউ-ই। আকাশ পাতাল চিন্তা ঢোকে মাথায়? ক্যামনে বাচ্চা অইবো জুলেখার!

:

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে নদীর পারে নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে এগিয়ে যাই আমরা। জুলেখার মাকে দেখি তার ঘাটে লাগানো নৌকার গলুইয়ে বসা। ভেতরে তার মেয়ে জুলেখার আকাশ ফাটানো চিৎকার। গত রাত থেকেই নাকি মানব শিশু জন্মদানের কসরত করছে ১৫-বছরের ছিপছিপে ছোট খাটো আমাদের জুলেখা। বসন্ত শাশুড়ির নৌকোয় জুলেখাকে তুলে দিয়ে খুব ভোরেই চলে গেছে দূরের চরে মাছ ধরতে নিজ নৌকো নিয়ে। কি করবো বুঝতে না পেরে কালো মুখ করে ফিরে আসি আমরা আমাদের যার যার ঘরে। পরদিন স্কুলে যাওয়ার পথে আবার জুলেখার চিৎকার শুনি আমরা। মানে ২-রাত ২-দিন থেকে কাতরাচ্ছে ছোট এ মেয়েটি সন্তান প্রসবের জন্যে। মা তাকে গ্রাম্য বেত-পড়া, পানি-পড়া, জুতা-পড়া, মরিয়ম ফুল সবই দিয়েছে। গ্রাম্য "দাই" সাহস দিয়ে বলেছে, "আল্লাহ আল্লাহ করেন। এ ছাড়া কুনু উপায় নাই আর"! তাই জুলেখা আর তার মা কেবল "আল্লা আল্লা করতে থাক এ বিপদে"। আর বসন্ত ফেরেনি এখনো চর থেকে তার জরুরি মাছ ধরা ফেলে। জুলেখার মায়ায় আমরা এগারো বন্ধু মিলে ওর মায়ের সাথে 'আল্লাহ আল্লাহ" ডাকে যোগ দেই!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত একটা "প্রাথমিক চিকিৎসার বই" ছিল আমার। তাতে ছবিসহ সন্তান প্রসবের নানাবিধ কথা বলা ছিল। কিন্তু আমাদের মত কিশোরদের পক্ষে জুলেখার উপর তার প্রয়োগ সম্ভব ছিলনা। ১১-বন্ধু মিলে তার মাকে বইটি দেখাই আমরা আর হাসপাতালে নেয়ার কথা বলাতে অসহায় মা সম্মত হয় তাতে। এবং স্কুল বাদ দিয়ে কারো অনুমতি ছাড়াই একটা মাছ ধরার ছোট নৌকোয় জুলেখা আর তার মাকে নিয়ে শহরে যাই আমরা। পথে ক্রমাগত খিঁচুনি দিতে থাকে, আর বার বার অচেতন হয় জুলেখা। আমরা খুব ভয়ে পেয়ে যাই তার এ অবস্থায়। প্রবল বৃষ্টি নামে আকাশ ভেঙে বর্ষার আকাশে জল ভরা নদীতে। আমরা ন'জনে ক্রমাগত বৈঠা আর দাঁড় টানতে থাকি তীব্র উজান স্রোতে। একজনে নৌকোর পানি ফেলতে থাকি, যাতে বৃষ্টির পানিতে ডুবে না যায় নৌকোটি। আর একজনে ওর মায়ের সাথে খিঁচুনি দিয়ে বাঁকা হয়ে যাওয়া জুলেখাকে ধরে রাখি চেপে নৌকোর পাটাতনের সাথে। অবশেষে জবজবে বৃষ্টিতে ভিজে জুলেখাকে পলিথিনে ঢেকে পায়ে চালানো রিক্সাভ্যানে করে উপস্থিত হই আমরা সদর হাসপাতালে।

:

ইমারজেন্সিতে চোখ উল্টানো মুখ বাঁকানো জুলেখার মুখে ফ্যানা দেখে সবার চোখে জল আসে আমাদের এই ভেবে যে, "জুলেখা বোধহয় এই মরেই গেল"। ডাক্তারটা বললো, "গ্রাম্য মহিলাদের পেটের বাচ্চা ধরে টানাটানি করাতে শিশুটি মারা গিয়ে 'একলামসিয়া' হয়েছে তার। হাসপাতালে এখনই পেট কেটে অপারেশন করতে হবে জুলেখার। লাগবে কিছু ঔষধ আর রক্ত"। ঘটনাক্রমে আমাদের ৩-জনের রক্তের গ্রুপ মিললো জুলেখার সাথে। আমাদের কিশোর বন্ধুদের জুলেখার প্রতি এ দরদ থেকে আপ্লুত হলো ডাক্তাররা সবাই। বললো, "হাসপাতাল থেকেই বেশিরভাগ ঔষধ দেবে তারা"। এবং তাই করলো। মাত্র ৩০০-টাকার ঔষধপত্র কিনতে হলো জুলেখার জন্যে। আমাদের ৩-জনের ৩-ব্যাগ রক্ত নিলো জুলেখাকে দিতে। প্রায় ২-ঘন্টা পর জুলেখার মৃত সন্তানকে টুকরো করে বের করা হলো তার পেট থেকে। ৩-ডাক্তারের সবাই বললো, "তোমরা এভাবে না আনলে অবশ্যই মারা যেত জুলেখা! ব্রেভ ইলেভন বয়েজ"।

:

আমাদের ১১-বন্ধুর প্রাক্তন প্রেমিকা জুলেখাকে হাসপাতালে রেখে নৌকো নিয়ে ফিরে আসি আমরা গাঁয়ে। ক্রোধে গাঁয়ে ফিরে বসন্তকে নদীতে আটকে মার দেই আমরা খুব। তার নৌকোটি কেড়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম সবাই মিলে একরাতে। এ কারণে গাঁয়ের কেউ মন্দ বলেনি আমাদের। ৮-দিন পর মায়ের সাথে এক বিকেলে মোটর লঞ্চে ফিরে আসে আমাদের গাঁয়ে আমাদের ভালবাসার জুলেখা। তা দেখে পুরাকৃতি সায়াহ্নের মতো ভাললাগার বিস্মরণে ভেসে যাই আমরা ১১-বন্ধু। জ্বলন্ত উনুনের তাপদাহে পুড়ে অঙ্গার হয়ে জুলেখা আর ফিরতে চায়না বসন্তের নৌকোয়। নিজ নিজ ঘরের ডাব, ডিম, পাকা পেঁপেঁসহ প্রত্যহ জুলেখার নৌকোতে যাই আমরা ১১-বন্ধু। আবার আমাদের পুরণো প্রেম জাগ্রত হয় আদিম বুনো দমকা বাতাসের মত। কিন্তু আমরা কি পঞ্চ-পাণ্ডব? যারা একসাথে বিয়ে করতে পারি জুলেখাকে ১১-জনে? এবং একদিন আমাদের উদারতায় বসন্তের নৌকোয় ফিরে যায় জুলেখা আবার। জুলেখাকে হারিয়ে পুরণো প্রেমের আত্মহননের শোঁকগান কোরাসে গাইতে গাইতে প্রেমিক পাখি হয়ে, আমরা উড়তে থাকি জুলেখার চারদিকে জল নদী আর কৈশোরিক ভাললাগার আকাশে! এখন এ পৌঢ়ত্বে এসেও জুলেখাকে ভুলতে পারিনি আমি। মনের কোণে ভেসে থাকে যৌবনময়ী জুলেখার হাস্যজ্জ্বল প্রেমজ প্রেমময়ী চাহনী!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

জলেরাই ধুয়ে দেয় জীবনের দু:খমালা সমগ

.

কবছর আগে একদিনের একটা সেমিনারে দিল্লি গিয়েছিলাম আমি। পৃথিবীর যেখানেই যাই, মানুষ আর তার জীবনধারা ঘুরে দেখার সখ আমার কৈশোর থেকেই। তাই স্বপ্নের শহর বোম্বে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে ট্রেনযাত্রা বেছে নিলাম বোম্বে যাওয়ার। আরব সাগর তীরের স্বপ্ন-নগরী বোম্বে বা এখনকার নাম মুম্বাই। কত মানুষ, কত বৈভব, কত ভোগ, কত ট্রাজেডি, আর কত ঘটনার ছড়াছড়ি এই বোম্বেতে! সেই ব্যস্ত শহরে আমার মত বাংলাদেশের অতি সাধারণ এক অখ্যাত মানুষ!

:

পরিচিত এক ভারতীয় বন্ধুকে হোটেল বুকিং দিতে বলাতে, সে অভিজাত চিম্বারের ৫-তারকা "The Fern" হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে আমাদের, যার প্রতিদিনের ভাড়া ভারতীয় ৬,৫০০ রুপি। হোটেলেই ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারের ব্যবস্থা। এখানে সেখানে ঘুরে এক সময় জুহু বিচে ঘুরতে যাই সঙ্গী বন্ধুটিসহ। হঠাৎ বৃষ্টিতে আশ্রয় নেই সমুদ্র 'ঝড় পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে', যেখানে সস্তা লুচি আর চানার ডাল বিক্রি করে লাক্ষাদ্বীপের ৪০-বছরের নারী ললিতা আর তার ১০/১১-বছরের কন্যা জয়া। বৃষ্টিস্নাত ক্রেতাহীন ললিতা থেকে চারটে লুচি আর একটু ডাল ১০-টাকায় কিনে খাই আমি! সাথে মাটির কাপে ৩-রুপির চা। সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে অনুরোধ করি লুচি-ডাল-চা খেতে। ঘন্টা দুয়েক আগে ৫-তারকা হোটেলে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট করে এ দরিদ্র নারীর হাতের লুচি খেতে রুচিতে বাঁধে বন্ধুর। তার আপত্তিতে তাই একারই অর্ডার দেই আমি কেবল নিজের জন্য। ১৩-টাকার নাস্তা-চা খেতে খেতে কথা বলি ললিতার সাথে, অনেক কথা। ভাল হিন্দি বলতে পারে সে এখন, দক্ষিণের কেরালার টানের হিন্দি। চেন্নাই এক্সপ্রেসের নায়িকা দিপীকা পাড়ুকনের টানের মত।

:

আরব সাগরমাঝে ২০/২৫টি দ্বীপমালা নিয়ে ভারতের লাক্ষাদ্বীপ। লাক্ষার কাভারতি দ্বীপে বসতি ছিল মালয়ালাম ভাষিক ললিতার। সুনামির সময় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ঘরসহ সমুদ্রে ভাসিয়ে নেয় তাদের পুরো পরিবার। ২-ছেলে আর স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়নি দানবীয় মহাসমুদ্র। জলোমানব মৎস্যজীবীদের সমাধি হয়তো সমুদ্রেই হয়েছিল তাদের। মেয়ে জয়াসহ দুদিন পর নৌবাহিনীর উদ্ধারকারী জাহাজ তাদের জলরাক্ষসের হাত থেকে তুলে বোম্বে বন্দরে ফেলে যায়। সেই থেকে ভাসমান জীবন ললিতা আর জয়ার। ধনাড্য বিশাল অট্রালিকাময় বোম্বেতে রাস্তায় ভাসমান মানুষের অভাব নেই। অনেক বস্তি - মাঠ, রাস্তা আর সরকারি জমিতে। ললিতারা সেখানে তরকারি, পিঠা, চা বিক্রি করে সড়কে। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন তাদের খাবার। ফল কেটে বিক্রি করে অনেক ললিতা-জয়া। তাদের ফলও বেশ সস্তা ফুটপাথের!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বীপ গাঁয়ে বড় হয়েছি, যার চারপাশে বৃহৎ নদীঘেরা। ছোটবেলায় ঝড়ে মেঘনাতে নৌকোতে ডুবেছিলাম আমি। সারারাত ঘোর অন্ধকারে সাঁতরে কাটিয়েছিলাম মায়ের সাথে। ভোর হলে অন্য জেলে নৌকোর লোকজন জীবন বাঁচায় আমার আর আমার মায়ের! ললিতা-জয়ার বেঁচে থাকার মাঝেও মা আর নিজের বেঁচে থাকার এক চমকপ্রদ ঐকতান খুঁজে পাই আমি। মাকে হারিয়েছি আজ ১৮-বছর! তাই পরদিন আবার মায়ের মত ললিতার মাটির কাপে চা খাওয়ার প্রবল তাড়নায় হোটেলে থাকতে পারিনা আমি! অনুক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত করে আমায় যেন মায়ের হাতের শীতের সকালের চা টেনে নেয় জুহু বিচের ৩-রুপির চায়ের কাপে। যেখানে চা বানাচ্ছে মা ললিতা আর লুচি ভাজছে তার কন্যা জয়া। অমৃতের মত সে চা খাওয়া দেখে সহযাত্রী বন্ধু বিস্মিত হয় আমার দিকে তাকিয়ে! আর ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলে "তুই আর মানুষ হলিনা। চরের মানুষই রয়ে গেলি"!

:

৩-দিন পর হাওড়ার উদ্দেশ্যে যখন বোম্বের 'কুইন ভিক্ট্রোরিয়া' স্টেশন ছাড়ে আমাদের বিশালাকায় সর্পিল ট্রেন, তখন প্লাটফরমের ছুটে চলা হাজারো মানুষের মাঝে কেবল ললিতা আর জয়াদের মুখ ভাসতে থাকে আমার হৃদ-মননে। পৃথিবীর সহস্রাব্দের চিরন্তন নিষ্ঠুরতার মাঝে সর্বত্র ললিতা-জয়াদের এক অনন্ত জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতে দেখি আমি! ব্যাঙাচির জীবনচক্রের মতো এরা বৈশ্বিক তাড়নায় জেগে থাকে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর, নিঝুমদ্বীপ কিংবা লাক্ষাদ্বীপে। প্রচন্ড গতির ছুটে চলা ট্রেনে দক্ষিণের বিনম্র ঝাঁঝালো বাতাস আমায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় বার বার! আর নিউরনের চিন্তার শৃঙ্খলিত খাঁচায় অনুক্ষণ আমার প্রিয় কবি এসে শোনাতে থাকে হৃদ-মননের গান, যে গানে দ্রোহ আছে, জীবনবোধ আছে। বোম্বের কুড়লা থেকে হিমগিড়ি পর্যন্ত ভূমিধ্বস ক্ষীপ্রতায় ভারতীয় ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রচণ্ড গতিময়তার মাঝেও কবি শোনাতে থাকে আমায় এমন হৃদ-হরণের রক্তস্নাত কবিতা—

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

"আসুন আমরা আগুন সম্পর্কে বৃথা বাক্য
ব্যয় না করে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি
জ্বালিয়ে দিয়ে বলিঃ 'এই হচ্ছে প্রকৃত আগুন।
মীটসেফ খোলা রেখে, বিড়ালকে উপদেশ দিয়ে
অযথা সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, আসুন
আমরা মীটসেফের দরোজাটা বন্ধ করে দেই।'
পুঁজিবাদী শোষণের পথ খোলা রেখে
সম্ভব নয় প্রকৃত মুক্তির স্বপ্ন দেখানো।
ফুঁটো চৌবাচ্চায় জল থাকবার কথা নয়,
সে বেরিয়ে যাবেই; ওটাই জলের ধর্ম।
আমাদের ধর্ম ভিন্ন হলেও টাকার ধর্ম একই।
বুদ্ধিমান কৃষক তাই আগাছা উপড়ে ফেলে সময়মত,
নইলে তার কষ্ট-কর্ষিত জমিতে কি ফলতো ফসল?
পরগাছার আক্রমণ থেকে ফলবান বৃক্ষকে
রক্ষা করতে হয় পরগাছার গোড়া কেটে দিয়ে।
রক্তচোষা জোঁকের মুখে দিতে হয় থুথু, অথবা চুন,
প্রচন্ড আঘাত ছাড়া
পৃথিবীতে কবে কোন দেয়ার ভেঙেছে?
পরশ্রমভোগী ধনিক শ্রেণীর সর্বনাশ ছাড়া দরিদ্রের
পুষ্টিসাধনের সংকল্প হচ্ছে চমৎকার অলীক কল্পনা।
সুফল লাভ কি সম্ভব সুকর্ম ব্যতিরেকে?
কিংবা শস্য ভূমিকর্ষণ ছাড়া?
হাতুড়ে বৈদ্য গাংরিন সারাতে চান
ক্ষতস্থানে পুরনো ঘি মালিশ করে,
শিক্ষিত ডাক্তার পরামর্শ দেন অপারেশনের।
তাতে কিছু রক্তপাত হয় বটে,
হয়তো কেটে ফেলতে হয় কোন প্রিয় অঙ্গ--
কিন্তু ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য ওটা এমন কিছু নয়।
এর কোনো সহজ বিকল্প নেই। এটাই নিয়ম।
কথার ফুলঝুড়িতে চিড়ে ভিজানোর ব্যর্থ চেষ্টায়
সময় নষ্ট না করে আসুন আমরা জলের কথাই বলি!
:
কিন্তু মানুষের পুরো জীবন আর চোখ ভরাইতো কেবল নোনতা জল। তাই কবির আহবানে কিসব জলের কথা বলবো ভেবে পাইনা আমি! হাওড়ার দিতে ট্রেন এগুতে থাকে। আর আমি এ চিন্তনে ডুবে যাই, কখন জলের কাছে যাবো! আমার গাঁয়ের জল, নদী, নৌকো! সেতো অনেক দূর! হ্যা, একদিন হয়তো জলের কাছেই যাবো। যে জল ধুয়ে দেবে জীবনের সকল ক্লান্তিভরা দু:খমালাকে। যে দু:খরা গলাগলি করে থাকে সারাক্ষণ আমাদের সাথে! আর ঘুমোয় এক বালিশে মাথা দিয়ে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বল্টুর সন্তান জন্ম নিয়ে "জাস্ট ফান"

:

হিমাচলের বাসিন্দা বল্টু আমাদের অফিসের বেয়ারা। কোয়ার্টারে একাই থাকে। ছুটি না পাওয়ায় বেচারা বছর তিনেক হলো বাড়ি যেতে পারেনি। হঠাৎ সেদিন দেখি অফিসে সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। দেশ থেকে খবর এসেছে ওর ছেলে হয়েছে।

আমি ডেকে বললাম , "বল্টু, এটা খুশখবরী হলো কিভাবে ? তুমিতো অনেকদিন বাড়ি যাওনি !"

নিরুত্তাপ জবাব এলো, "আমাদের মুলুকে এটা একটা সাধারণ ঘটনা। বাড়ির পুরুষরা বাইরে থাকলে আত্মীয়স্বজন আর প্রতিবেশীরাই বউদের দেখভাল করে।"

বড়বাবু রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলেন- "ছেলের পদবী কী হবে তাহলে ?"

শুনে বল্টুর জবাব, "এটা নির্ভর করছে কে দেখভাল করেছে তার ওপর । যদি দুজন প্রতিবেশী করে থাকে তবে দ্বিবেদী, তিন জন করে থাকলে ত্রিবেদী আর চার জন হলে চতুর্বেদী !"

এটা শোনার পর প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেলো। প্রেস কনফারেন্সের কায়দায় বল্টু এক এক করে তার জবাব দিল .... "সবাই মিলে যদি দেখভাল করে থাকে তাহলে মিশ্র, যদি বউ প্রতিবেশীর পরিচয় জানাতে লজ্জা পায় তাহলে শর্মা, যদি নাম গোপন রাখতে চায় তাহলে গুপ্তা, আর যদি মনেই না করতে পারে তাহলে ইয়াদব !"

অফিসের কমবয়েসীরা ফোড়ন কাটলো, "কেউ যদি জোর করে দেখভাল করে থাকে কিংবা তোমার বউ যদি নিজেই এগিয়ে যায়?"

জবাব এলো, "প্রথম ক্ষেত্রে দোশী আর পরেরটায় জোশী !"

সব শুনে বড়বাবু বলে উঠলেন, "ব্যাটার জন্মের পেছনে দেখি গোটা দেশের অবদান রয়েছে।"

বল্টু গম্ভীর হয়ে বললো, "সেক্ষেত্রে পদবী হবে দেশপান্ডে !"

সত্যের সন্ধানে

shottershondhane.com

বেঁচে থাকার রূপান্তরকামী সুবর্ণরেখা!

:

যখন গ্রাম্য গঞ্জের অনাবিল মানুষের আনন্দধ্বনি মিলেমিশে একাকার ছিল! যখন নীলাভ সবুজ অপার্থিব ভালবাসায় স্নাত ছিল পুরো গ্রাম! যখন আকাশের কাছাকাছি মেঘেরা এক বিযুক্ত প্রেমময়তায় ভরা ছিল। যখন সমুদ্রের দিনরাত মিলেমিশে একাকার জলকণ্ঠস্বরে ভরে উঠতো আমাদের জীবন! যখন হিন্দু-মুসলমানরা মিলে মিশে একসাথে জারি-সারি গানের আয়োজন করতো, মিলে মিশে বসবাস করতো এক অসাম্প্রদায়িক সমাজে, তখন আমার জন্ম দক্ষিণ বঙ্গের বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত এক গ্রামীণ দ্বীপে। আমার বাবা নাপিত পেশাধারী ছিলেন ঐ গ্রামেই। তার সাথে হাতে কলমে চুলকাটার প্রশিক্ষণ নিয়েছি আমি হরলাল শীল। বাবাকে দেখেছি গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকদের বাড়ি গিয়ে চুল কাটতে। কোন টাকা দিতোনা তারা, বছর শেষে পৌষ মাসে ধান দিতো পারিশ্রমিক হিসেবে। কেবল সাপ্তাহিক বাজারের দিন একটা পিঁড়ি পেতে বাজারের একধারে বসতেন তিনি দরিদ্রদের চুল-দাড়ি কাটতে। যাদের ধান বা জমি ছিলনা, সেসব দরিদ্রতা বাজারে চুল কাটতো নগদ পয়সা দিয়ে। আমি পরিণত বয়সে বাজারে শহরের মত একটা "সেলুন" করি। যেখানে চেয়ারে বসে চুল কাটার সুযোগ ছিল। প্রথমে দরিদ্ররা, পরবর্তীতে চেয়ারে বসে চুল কাটা শুরু করলো স্থানীয় বিত্তবানরাও।

:

বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাই এখন আর চুল কাটতে পারেন না। সাতাশি বছর বয়স হয়েছে তার। বাড়িতেই থাকেন শুয়ে বসে! যশোরে হিন্দু পাড়ার শীল পরিবারে বিয়ে করেছি আমি প্রায় কুড়ি বছর হলো। আমার কন্যাটি এখন ক্লাস টেনে পড়ে। পনের বছর বয়স হয়েছে তার। ও যখন পেটে, তখন ওর মা দেবী স্বরসতীর পুজো দিতো প্রত্যহ, তাই মেয়েটি আমার দেবীর মতই সুন্দরী হয়েছে! ওর নাম সবিতা রেখেছিল আমার মৃত মা! আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষা দেবে কন্যাটি। নিরঞ্জন নামের ছেলেটি ছোট আমার। অষ্টম শ্রণিতে পড়ে সে। স্কুলের ফাঁকে এবং অফ টাইমে আমার সাথে সেলুনে বসে ও। চুল কাটার হাতেকলমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। একদিন ভাল 'হেয়ার স্টাইলার' হবে সে, এটা তার স্বপ্ন। আমিও চাই পড়ালখা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াক ছেলেটি আমার। চাই শহরে গিয়ে চাকরি করুক কিংবা ভাল কোন সেলুন দিক ঢাকায়। সংখ্যালঘু হিন্দু হিসেবে গ্রামে নানাবিধ সমস্যা, আর হতাশায় ভুগি আমরা প্রতিনয়ত।

:

আমাদের গাঁয়ে নাপিত, ধোপা, মাছধরা হিন্দু জলদাসদের অন্তত একশ পরিবার ছিল। যার অধিকাংশ পরিবার ছিল নিতান্তই দরিদ্র। সবাই পরিশ্রম করে কোন রকমে জীবন নির্বাহ করতো। তিন গ্রাম দূরের ধনী গৃহস্থ হিন্দু দত্তদের বাহির বাড়িতে পুজামন্ডপ ছিল একদিন। সেখানে আমাদের গাঁয়ের সকল দরিদ্র হিন্দুরা যেতাম পুজো দিতে। কিন্তু নদী ভাঙনে প্রথমে দত্তদের বাড়ি ও পরবর্তীতে আমাদের গ্রামও বিলিন হলে, সব হিন্দু পরিবারগুলো যে দিকে পারে নানাভাবে চলে যান। আমাদের প্রতিবেশী অন্তত ২৪-ঘরের মাত্র তিনটে ঘর এখন টিকে আছে। শুনেছি বাকিরা সবাই নাকি ভারতে চলে গেছে নানাবিধ উপায়ে। এখন যে তিনটি পরিবার আছে সরকারি বেরী বাঁধে, তার দুটো নাপিত আর একটি ধোপা পরিবার। একজনে বাজারে লন্ড্রী চালায়। আমিসহ ২-পরিবার মানুষের চুল কেটে যাই পুরো বছর। এলাকার সকল মানুষ মুসলমান। তারা কখনো সরাসরি অত্যাচার করেনা আমাদের। বাবরী মসজিদ বা অন্য নানাবিধ ইস্যুতে কখনো আমাদের ঘর ভাঙেনি বা আগুন দেয়নি এ গাঁয়ের মুসলমানরা। সে হিসেবে ভাগ্যবান বৈকি আমরা এখানের ৩-ঘর হিন্দু পরিবার! যেখানে শুনছি ২০০১-এর নির্বাচনের পর বরিশালের গৌরনদীর অনেক হিন্দু বাড়িতে নাকি আগুন দেয়া হয়েছিল। অনেক যুবতী হিন্দু মেয়েকে নাকি ধর্ষণ করেছে গৌরনদী, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা ইত্যাদি এলাকায়!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

একদিন কন্যা সবিতা এসে তার মাকে বললো - পাঠ্য 'হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বইটি একদিনও স্কুলে পড়ানো হয়নি তাকে। কিন্তু বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় একশ মার্কের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে তাকে। ধর্ম টিচারকে তার একটা 'টেস্ট' পরীক্ষা' নিতে অনুরোধ করলে ভ্রু কুচকে সে বললো - "নাউজু বিল্লাহ, আমি মুসলমান হয়ে তোদের কাফেরী হিন্দু ধর্মের বই ধরবো? আমারে জাহান্নামে নিতে চাস তুই"? কি আর করা! বিনা পড়ানোতে, বিনা টেস্টে পড়ে যেতে বললাম মেয়েটিকে। ছেলে নিরঞ্জনকেও বললাম একই কথা। একদিন সবিতার কান্না দেখে তার মার কাছে জানতে চাইলাম কারণ। আমার স্ত্রী বললো - "বাজারের চা দোকানী সুলেমান মোল্লা প্রেমপত্র দিয়েছে সবিতাকে। সবিতা তা ফিরিয়ে দিলে, খারাপ অশ্লীল কথা বলেছে তাকে। এ নিয়ে নিরঞ্জন প্রতিবাদ করলে, নিরঞ্জনকে ঘুষি দিয়েছে সুলেমান"! দুপুরে মোল্লা বাড়ি গিয়ে সুলেমানের বাবার কাছে গিয়ে বললাম তার ছেলের কুকর্মের কথা। কিন্তু পিতা ছেলের কোন দোষ না ধরে বললো - "ব্যাটা, তোমরা তো মালাউন। একটা মালাউনের মাইয়ারে বিয়া করতে চাইছে আমার পোলা, এইডা তোমার ভাগ্য না? মুসলমানের বউ হইয়া ভাল থাকপে না তোমার মাইয়া"? বখাটে ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে উল্টো বিপদে পড়লাম আমি!

:

ছসাত বছর আগে নদীতে বাড়িটা ভাঙার সময় বাড়ির সাথে ত্রিশ শতক ধানী জমিও ছিল বাবার। এখন পলিমাটির চর জেগেছে ওপারে। সেখানে বোরো ধানের চাষ শুরু হয়েছে। আমাদের মোট চল্লিশ শতক জমির উত্তর দিকে শফি দেওয়ানের জমি। প্রায় চার পাঁচ হাত আমার জমির মধ্যে ঢুকে ধান লাগিয়েছে সে। পুর্ব দিকে শফিকুল্লাহ গাজী আল ধরেছে অন্তত দুই ফুট আমার জমির ভেতরে ঢুকে। দক্ষিণ আর পশ্চিমে যাদের জমি, তারা ঢুকতে দিচ্ছেনা আমাকে তাদের জমিতে। তারা দুজনেই সঠিক সীমানা ধরে নিজ নিজ জমিতে চাষ করছে। অন্যে আমার জমি দখল করেছে বলে তারা কি তাদের জমি ছেড়ে দেবে?

একদিন বাজারের মসজিদের ইমাম এলো সুন্নতি স্টাইলে 'মোচ' ছাটতে সেলুনে আমার। এসেই ঝাঁঝাঁলো সুরে বললো "তোদের খামোখা নোমো-চাড়াল-মালাউন কই আমরা"? বিনীতভাবে চোখ তুলে জানতে চাই কি অইলো ইমাম সাব? তিনি মেজাজ গরম করে বললেন - "দেখ, গরুর গোস্তো বেচা-কেনা করছে বইলা বাপ-বেটাকে পিটাইয়া খুন করছে ইন্ডিয়ায় হিন্দুরা। এখন তোগো কি করতে হয় ক তো তুই"? ভয়ে ভয়ে বললাম - "আমরা এখানের গরিব নাপিত, আমরা কি দোষ করলাম ইমাম সাব? আমরা কি ইন্ডিয়ার লোক? ইন্ডিয়ার ঐসব লোক কি করলো তা ক্যামনে কমু আমরা?" দয়ালু ইমাম সাব মেজাজ খারাপ বলে পয়সা না দিয়েই চলে গেলেন। ভয়ে আর টাকা চাওয়ার সাহস পেলাম না আমি!

:

এক রাতে বাবা মারা গেলেন দীর্ঘদিন রোগে ভুগে। এলাকায় হিন্দু পুরুষ কেবল আমি আর ছেলে নিরঞ্জন। প্রতিবেশী বাবুল শীল আর বাজারের তরুণ কামিনী ধোপা গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি গেছে মতুয়াদের মেলা দেখতে। বাবাকে চিতায় তোলা, দাহ করা কিছুটা জটিল হলো আমি আর নিরঞ্জনের জন্য। প্রতিবেশী মুসলমান যুবক তসলিম আর কোরবান মজুরী খাটে এখানে-ওখানে দৈনিক ৩০০-টাকা হিসেবে। তাদের দুজনকে ঠিক করলাম নগদ ৬০০ টাকায়। তারা চিতার কাঠ চিড়ে আমাদের বাপ-বেটাকে সাহায্য করবেন বাবার দাহ-কর্মে। কোন আপত্তি না করেই ওরা কাজে লেগে গেলো আমাদের সাথে দাহ কর্মের কাঠ চেড়ায়। কিন্তু খবর গেলো ইমাম সাব আব্দুর রহমানের কাছে। তিনি এসে চোখ পাকিয়ে বললেন - "তোমার সাহসতো কম না। মানুষ পোড়ানোর মত জঘন্য পাপ কামে নিয়োগ করছো মোসলমান তছলিম আর কোরবানরে? নিজেদের পরকালতো নাই, অন্যের পরকালও শেষ করতে চাও ব্যাডা?" হুজুরের ধমকে মুসলমান ২-যুবক পালিয়ে গেল বিলের ভেতর দিয়ে। আমি আর ছেলে নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে রইলাম বাবার মৃতদেহের পাশে নির্বাক হয়ে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কদিন পর বাজার সংলগ্ন স্কুল মাঠে শুরু হলো বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল। সারাদিন রাত ব্যাপী ৩-দিনের এ মাহফিলে অনেক বক্তা আনা হলো দেশের নানা স্থান থেকে। ওয়াজের একটা মাইক লাগানো হলো আমার সেলুনের চালে। অন্যটি কামিনী ধোপার ঘরের খুঁটির সাথে! সারাদিন রাত ওয়াজে নানাবিধ কথা শুনতে থাকলাম আমরা। এক বক্তা হিন্দুদের কেন "মালাউন" বলা হয় তার চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিলেন। অধিকাংশ পড়ালেখা না জানা শ্রোতারা হাততালি দিয়ে উপভোগ করলেন মালাউনের ব্যাখ্যা। মানুষ পোড়ানো কত জঘন্য অপরাধ তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিলেন বাজারের ইমাম সাহেব নিজে। তিনিই এ ওয়াজের উদ্যোক্তা। চিতায় তুলে 'দাহ' থেকেই হিন্দুদের 'জাহান্নাম' শুরু বলে মন্তব্য করলেন তিনি। উদাহরণ হিসেবে কিছুদিন আগে আমার বাবার দাহ-কাজে মুসলমান যুবকের অংশগ্রহণ কত বড় "জঘন্য পাপ কাম" তারও ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙা, গরু বহনকারী মুসলমানদের অহরহ হত্যার নানাবিধ ঘটনার বর্ণনা করলেন তিনি ফিরিস্তি সহকারে। অথচ বাংলাদেশে আমরা হিন্দুরা কতইনা ভাল আছি মুসলমানদের দয়ায় তাও বললেন তিনি। বাংলাদেশের মুসলমানরা অনেক ভাল বলে হিন্দুদের থেকে 'জিজিয়া কর' আদায় করছেনা। আবার জাকাতও দেয়না হিন্দুরা। মানে আল্লাহকে হিন্দুরা ২-দিকেই ঠকাচ্ছে। সকল দর্শক শ্রোতা ইমাম সাহেব এমন গরম বক্তব্যে "আল্লাহ আকবর" ধ্বনি তুলে আকাশ বাতাস মুখরিত করলো।

:

৩-দিন ব্যাপী ওয়াজে এমনসব কথা শুনে আমার কন্যা, নাবালক পুত্র আর স্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। স্ত্রী বললো - "তার চেয়ে চলো ইন্ডিয়ায় চইলা যাই"! নিজের জেগে ওঠা ৪০-শতক জমির মাত্র ৩২-শতক এখন আমার দখলে, বাকিটা দুই প্রতিবেশী জোর দখল করে খাচ্ছে। তা বিক্রির জন্য ওপারে কথা বলতে গেলাম সাত্তার মল্লিকের সাথে। দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বুড়ো ধনী কৃষক সাত্তার মল্লিক বললেন - "কি মিয়া! জমি বেচবা ক্যান? ইন্ডিয়া চইলা যাইবা নি"? বললাম - "না চাচা। প্রায় ৮ শতক ঠ্যালাঠেলি কইরা দখল কইরা রাখছে শফি দেওয়ান আর শফিকুল্লাহ গাজী। আপনে কিনলে তারা আর দখলে রাখবার পারবো না। তা ছাড়া বাজারের নিকট জমি কিনা একটা ঘর তুলবার চাই"! ৪০-শতক জমির দাম কমপক্ষে ৪০-হাজার টাকা চরের বাজার দরে। কিন্তু ২০-হাজার টাকার বেশী দিতে সম্মত হলেন না সাত্তার মল্লিক। পানের পিক ফেলে বললেন - "মালাউনের জমি কিনলে অনেক ঝামেলা। ৩/৪ জনের কাছে বিক্রি কইরা গোপনে ইন্ডিয়া পলাইয়া যায়। তাই রেকর্ড পর্চা ঠিক করতে ঝামেলা হয় শেষে। বিশ হাজার টাকা দাম পাইবা তুমি! মুসলমানের জমি অইলে দাম বাড়াইয়া দিতাম আমি! আমি পরকালের ভয় করি। মানুষরে ঠকাইনা"!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

বেশ কজনের কাছে চুল কাটার টাকা বাকি ছিল। যথাসময়ে সব টাকা তুলতে পারলাম না। জমি বিক্রির কুড়ি হাজার টাকাসহ ঘরে মোট বিয়াল্লিশ হাজার টাকা হাতে এখন। অবশেষে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম স্ত্রী কন্যা আর পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে। অন্ধকার রাতে বিলের মাঝে গিয়ে ফোনে কথা বললাম বারাসাতের কালিকাপুর বসবাসকারী কাকাতো ভাই মহেষের সাথে। মহেষ অভয় দিলো আমাকে। বর্ডারে সে সব "লাইনঘাট" করে জানাবে বলে আশ্বাস দিলো। অমাবশ্যার দুদিন আগে এক ঘোর অন্ধকার রাতে ঘর ছাড়লাম আমি পুরো পরিবারসহ। বাজারের সেলুন যেমন আছে তেমনি অবস্থায় ঝাঁপ বন্ধ করে, রান্নাঘরে ভাতের পাতিলে ভাত তরকারি রেখে, ঘরের বাতি জ্বালিয়ে অত্যন্ত সঙ্গোপনে "ছিটু মাঝির" ট্রলারে উঠলাম আমরা। মুসলমান ছিটু মাঝি আমার প্রতিবেশী ভাল মানুষ। আমাদের রাতে পলায়নের কথা কাউকে বলবেনা বলে কথা দিলো সে আমাকে। তিনশ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে লাহারহাট ফেরিঘাটে নিয়ে যাবে আমাদের। সেখান থেকে স্থানীয় গাড়িতে বরিশাল শহরে যাবো আমরা। বরিশাল নথুল্লাবাদ থেকে চাকলাদার পরিবহণে বেনাপোল বন্দরে নিয়ে যাবে দালালদের একজন। তারপর দক্ষিণ চড়ইগাছি সীমান্ত দিয়ে রাতের অন্ধকারে দালালের মাধ্যমে ঢুকবো আমরা বনগাঁ। এ জন্য দালাল গ্রুপকে দিতে হবে চার জনে কুড়ি হাজার টাকা। এ কুড়ি হাজারের একটা অংশ নাকি পাবে বাংলাদেশের বিজিবি, অপর অংশ ভারতের বিএসএফ ও দালালরা। টাকা ছাড়া বর্ডার পার হতে গেলে গুলি করে ভারতের 'বিএসএফ'। কিন্তু টাকা পেলে তখন নাকি তারা মুখ ঘুরিয়ে থাকে অন্যদিকে।

:

রাত ১১-টার দিকে ইঞ্জিন চালিত ট্রলার স্টার্ট দিলো প্রতিবেশী ছিটু মাঝি! স্ত্রী, কন্যা, ছেলে আর চারটে বোচকা নিয়ে বসে আছি আমরা ট্রলারের ভেতরে। ঐ বোচকায় জরুরী কাপড় চোপড় নিয়েছি আমাদের। সাথে কিছু খাবার। বাকি সব রেখে এসেছি পুরো ঘরে যেমনটা ছিল। এমনকি চুলকাটার কাঁচি চিড়ুনীও সেলুনে রেখে এসেছি নিজে। ট্রলার মাঝ নদীতে চলে যাচ্ছে। বাঁধের উপর বানানো আমাদের কুঁড়েঘরের আলো তখনো দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট আভায়। সবাই তাকিয়ে রয়েছে ফেলে আসা ঘরের দিকে। কিন্তু অন্ধকারে কারো ভেজা চোখ কেউ দেখতে পাচ্ছিনা আমরা! কেবল আকাশের তারার দিকে চেয়ে অনুভব করছি সমুদ্র সন্ন্যাসী সৈকত কাঁকড়ার মতোন এক দম বন্ধ করা যন্ত্রণা! নতুন জেগে ওঠা চরের বালুর অপসৃয়মানতায় মতো আমাদের চিবুকে নুন, গালে নুন, ওষ্ঠাধর যেন নুনে স্থবির হয়ে থাকে অনেকক্ষণ! কন্যা সবিতার কণ্ঠে শুনি সদ্য ভেজা বধির খাতার মাঝে শুয়ে থাকা শঙ্খ, কড়ি আর সৈন্ধবলবণের ক্রন্দন! এক সময় দম বন্ধ হওয়া প্রাণতায় ঘুমের মাঝে যেন সমুদ্রের সকাতর প্রেমময়তা উতলে উঠে আমাদের চার জনের জীবনে! ক্ষীণ চাঁদ ডুবে যায় মাঝ নদীতে! ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছিটু মাঝি বলে - "দাদা, লাহারহাট চাইলা আইছি। তাড়াতাড়ি নামেন। আলো ফোটার আগেই ঘাটে ফিরা যামু আমি"! অন্ধকারে চারটে মানুষ একমুঠো জোনাকীর আলো হাতে নিয়ে নেমে যাই ট্রলার থেকে। এবার আমাদের উঠতে হবে ভটভটি গাড়িতে। ঘাটে নামিয়ে ট্রলার চলে যায় মাঝ নদীতে। এবার ফেলে আসা জলটুঙি পাহাড় হয়ে সামনে দাঁড়ায় আমার বাজারের সেলুন, তার ভাঙা চেয়ার আর ভাতের হাঁড়ির পাশে আলো জ্বলা গ্রামীণ কুঁড়েঘর! যেখানে হয়তো প্রদীপ জ্বলছে এখনো! কিংবা নিভে গেছে আমাদের না দেখে! এ যেন মানব জীবনের বেঁচে থাকার আরেক রূপান্তরকামী সুবর্ণরেখা!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

স্বপ্নেপ্রাপ্ত গুণীন চিকিৎসা এবং তারপর !

বছর দশেক আগে নিউজিল্যান্ডে ৪-মাসের প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফেরার প্রাক্কালে আমরা ৪-জনে প্লান করলাম, সাউথের 'ওবানে' তথা 'স্টুয়ার্ট আইল্যান্ডে' যাবো এবং সম্ভব হলে পাশের ছোটদ্বীপ 'কডফিস' আইল্যান্ডে। আমি নিজে, সহকর্মী প্লানিং কমিশনের তরুণ পরিকল্পনাবিদ জামান কবির, খ্রাইস্টচার্চ কলেজ অব এডুকেশনের মিউজিক টিচার 'সুইটি ডেইজি' ও ড্রামা টিচার 'বারবারা ডালিয়া'। আমরা প্রথম দুজন বাংলাদেশি অনভিজ্ঞ আর 'সুইটি' এবং 'ডালিয়া' ইতোপূর্বে নিউজিল্যান্ডের বেশ কটা দ্বীপ ঘোরায় বেশ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। যদিও অনেক দ্বীপ ঘুরলেও, বসতিহীন এ দুটো দ্বীপে তারা নাকি যায়নি আগে কখনো, তাই আমাদের আগ্রহে সানন্দেই রাজি হলো সহযাত্রী হতে আমাদের মাত্র ৪-মাস পরিচিত এ দুই তরুণি টিচার।

:

ভাড়া করা একটা 'ইয়াক' ইঞ্জিনবোটে পর্যাপ্ত শুকনো খাবার, পানি ইত্যাদি নিয়ে ০৪ নভেম্বর আমরা সবচেয়ে দক্ষিণের সিপোর্ট 'ব্লাফ' ত্যাগ করলাম। যেখান থেকে নিউইয়র্ক ১৫০০৮-কিমি, লন্ডন ১৮৯৫৮-কিমি, সিডনি ২০০০-কিমি আর ডগ আইল্যান্ড মাত্র ৬-কিমি দূরত্বে ছিল। কাকচোখের মত স্বচ্ছ টলটলে সমুদ্রজল কেটে আমাদের ইয়াক দুপুরের আগেই পৌঁছে গেল কাঙ্খিত 'ওবান দ্বীপে"। বিস্ময়কর জনমানবহীন সুনসান নিরবতার মাঝে পাথুরে দ্বীপে নামলাম আমরা। চারদিকে ছোট ছোট অনেকগুলো পাথুরে দ্বীপের সমাহার, তার মাঝে সুবজ বৃক্ষের সমারোহ। টলটলে জলে নানাবিধ রঙিন শ্যাওলা আর সপ্তপদি মাছ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল আমাদের। বিকেল হওয়ার আগেই আবার আমরা বোট ছেড়ে দিলাম 'কডফিস' দ্বীপে যেতে। কারণ আমাদের প্লান ওখানেই ভরা চাঁদের 'জোৎস্নাস্নাত' রাত কাটাবো আমরা। প্রচন্ড গতিতে ইয়াক চালিয়ে সূর্য ডোবার আগেই পৌছঁলাম আমরা 'কডফিস' দ্বীপে একটা ডুবন্ত পাথুরে পাহাড়ে প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে।

:

মানুষ, প্রাণি ও শব্দহীন এ দ্বীপে ফুটফুটে চাঁদের আলো এতোই আলোকিত করলো দ্বীপটিকে যে, আমাদের হাতের টর্চ জ্বালানোর প্রয়োজনই হলোনা আর। বৃষ্টিভেজা শীতল এ দ্বীপে কোন প্রাণির সন্ধান পেলাম না আমরা। রাতের আবছা আলো আঁধারে কিছু হাঁটাহাঁটি করে সারাদিন জার্নিতে ক্লান্ত আমরা ইয়াকের পাশে একটা সমতল ভূমিতে তাবু ফেলে ঘুমিয়ে পড়লাম অল্পতেই। ভোরের আলো ফুটতেই উৎফুল্ল আমরা উঠে পড়লাম ৪-জনেই ঘুম থেকে। এবার ঝকঝকে আলোয় দ্বীপের চারদিক চেয়ে মন আর চোখ জুড়িয়ে গেল আমাদের। ব্রেকফাস্ট সেরে সবার ইচ্ছে হলো দক্ষিণ প্যাসিফিকের এ পাথুরে দ্বীপের ঝলমলে স্বচ্ছ নীল জলে নেমে রঙিন মাছ ধরার। আমারো খুব ইচ্ছে জাগলো জলে নামতে কিন্তু জল প্রচন্ড শীতল, আর জলে নানাবিধ জীবন্ত রঙিন শামুক, স্টারফিস, সি-কিউকামবার ইত্যাদির সাথে পা লেগে গা চুলকাতে লাগলো আমার। তাই কিছুটা ভয়, ঠান্ডা আর ওসব সমুদ্র প্রাণির প্রতি খানিকটা এলার্জি তথা আতঙ্ক থাকাতে উঠে এলাম আমি একাকি।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

কিন্তু তরুণ জামান, সুইটি এবং ডালিয়া সুইম পোশাক পরে সমানে সাঁতরাতে থাকলো সমুদ্র মাছ আর ওসব প্রাণির সাথে পাল্লা দিয়ে। নানাবিধ রঙিন শামুক, ঝিনুক আর সপ্তরঙা পাথর নুড়ি সংগ্রহ করে ভরে ফেললো তারা ইয়াকের অর্ধেক প্রায়। তারপর ৩-জনেই আবার নামলো নেশাগ্রস্থের মত। আকস্মিক ড্রামা টিচার ৩০-বছরের তরুণি 'ডালিয়া' কেমন যেন চিৎকার দিয়ে উঠলো এক অবোধ্য ভাষায়। তার চিৎকার শুনে জামান আর সুইটি এগিয়ে গেল তার দিকে। আমিও দ্রুত একটা লাইফ জ্যাকেট নিয়ে এগিয়ে গেলাম হাঁটু জলে তার সাহায্যে। কিন্তু জল বেশি না থাকাতে জামান আর সুইটির সাথে ডালিয়া দ্রুত পৌঁছলো ইয়াকের কাছে। বললো, তাকে কিসে যেন কামড় দিয়েছে। সম্ভবত "সি-স্নেক" হতে পারে, যারা খুবই বিষাক্ত। তাই তাড়াতাড়ি ইয়াকে রক্ষিত 'এন্টিভেনাম' ইনজেকশন বের করতে বললো আমায়। তাই করলাম আমরা ৩-জনে তাড়াতাড়ি। কিন্তু ইনজেকশন দেয়ার পরও দ্রুত অবনতি ঘটলো ডালিয়ার অবস্থার। প্রচন্ড বিষের যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকলো ক্রমাগত। আমরা কি করবো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কোন এয়ার এম্বুলেন্সকেও খবর দেয়া সম্ভব ছিলনা। কারণ কডফিস দ্বীপে না আছে কোন বসতি, না কোন সেল নেটওয়ার্ক।

:

তাড়াতাড়ি ওর সুইমিং ড্রেস বদলিয়ে শুকনো পোশাক পড়ানো হলো ডালিয়াকে। জামান আর সুইটি বলল - "চলো পাশের দ্বীপ 'ওবানে' যাই, সেখানে কোন পর্যটক মোটেল বা ভাগ্যগুণে ডাক্তারও পেতে পারি"। কিন্তু প্রচন্ড স্পিডে গেলেও ৫/৬ ঘন্টা লাগবে ওবানে পৌছতে, তা ছাড়া সেখানে ঘটনাক্রমে কোন ডাক্তার পাওয়া গেলেও, এ রোগের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হাসপাতালহীন ওবানে করা যাবে বা তাকে এতোক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যাবে, এমন কথা মনে হলোনা আমার!

:

তাৎক্ষণিক একটা কথা মনে এলো আমার কিভাবে যেন। প্রিয় নাট্যকার হুমায়ুন আহমদের একটা নাটক "গুণীন" দেখেছিলাম অনেক আগে। ঐ নাটকে এক অনারোগ্য রোগিকে এক গ্রাম্য ওঁঝা বলেছিল, "কোন অবোধ্য রোগ যখন কারো হয়, তখন তার চিকিৎসার জন্যে কোন ভেষজ থাকে তার আশেপাশেই, প্রকৃতিই তা পাঠিয়ে দেয়। রোগির বাবা যেন খুঁজে দেখেন রোগির ঘরের আশেপাশে কোন অপরিচিত গুল্ম বা লতা জাতীয় কোন কিছু নতুন জন্মেছে কিনা? পেলে তার পাতা বা রস যেন খাইয়ে দেয় রোগীকে"। ডালিয়ার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে দেখে অবশেষে আমার নাটকে দেখা এ "অযৌক্তিক" কথা ৪-জন অসহায় মানুষের কাছেই আপাত "যৌক্তিক" মনে হলো। তাই ৩-জনেই দৌঁড়ে গেলাম অপরিচিত ভেষজ খুঁজতে। আমি, জামান আর সুইটি কাছাকাছি পাথরের ফাঁকে জন্মানো ৬-রকমের পাতাসমেত অপরিচিত ছোট গাছ উপড়ে নিয়ে এলাম। আমাদের কথামত পাতা চিবিয়ে খেলো ডালিয়া সব গাছের কিন্তু ব্যথা একটুও কমলোনা বরং বাড়তে থাকলো। এবার আরো চিন্তিত হলাম আমরা ৩-জনেই।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ভোরের কিরণমাখা শান্ত বাতাসে কে যেন বুদ্ধি খুলে দিলো আমার। একটু অদুরে সমুদ্রের বালুতট যেখানে জল মিশেছে এমন স্থানে ক্যাকটাস জাতীয় ছোট গাছ দেখলাম একটা। যার অর্ধেক অংশ বালিতে, অর্ধেক জলের কাছে ভাসছে। লম্বা মত তার পাতাগুলো খুবই অদ্ভুৎ সুন্দর। বিস্ময়কর তার হলুদ রঙের ফলগুলো। একটা ডালে একগুচ্ছ চোখ জুড়ানো সোনালী রঙের ছোট ফল। মনে হলো এ গাছটার ঐ ফলগুলোই হতে পারে এ বিষের ঔষধ। মুখে দিয়ে দেখলাম মারাত্মক তেতো স্বাদ, অনেকটা চিরতার মতো। ডগাসহ ফল ছিঁড়ে আনলাম এক দৌঁড়ে। বিরক্ত হয়ে ডালিয়া বললো, "এসব ফালতু ফল আর খাবোনা। আমাকে বাড়ির দিকে নিয়ে চলো, আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি"। তারপরো আমার অনুরোধে একটা ফল চিবালো সে এবং চিবিয়ে বললো, "হ্যা মিস্টি লাগছে ফলটি এবং বিষ কিছুটা কমছে মনে হচ্ছে"। আমার চিবানো তেতো ফলের স্বাদ ডালিয়ার কাছে মিষ্টি লাগছে বলাতে, আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো আরো। সম্ভবত এটাই ডালিয়ার ঔষধ! তাকে আরো ফল চিবুতে দিলাম। এবং ১০-মিনিটের মধ্যে এ ফলের ক্রিয়া হলো মারাত্মক ইতিবাচক। ৪/৫-টা গোটা চিবানোর পর ডালিয়ার ব্যথা ৯০% কমে গেল। সে বেশ সুস্থ্য হলো ১০-মিনিটের মাথায়ই। চারদিকে খুঁজেও ঐরূপ গাছ আর পেলাম না ২য়টা কর্ডফিস দ্বীপে। তাই ঐ গাছটির ডাল ভেঙে নিলাম ফলসহ বাংলাদেশে নিয়ে আসবো বলে।

:

আমাদের ৪-জনেরই ধারণা জন্মেছিল ডালিয়া মারা যাবে এ দ্বীপে এ বিষক্রিয়ায়। আকস্মিক সহযাত্রী ডালিয়ার জীবনে তোলপাড় করা ঝড়ের নাছোর দাপটে আমরা ৪-জনেই প্রায় লণ্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিলাম। ডালিয়ার আসন্ন মৃত্যু কল্পণায় আমাদের সবার করুণ ঠোঁটে বিষাদের শঙ্খ নিনাদ বেজে উঠেছিল প্রায়। কিন্তু মহাজাগতিক এ ভেষজ গুল্ম চিকিৎসায় সুখাতুর বাহান্ন তীর্থের কাকের মতো আমাদের হৃদপিণ্ডে যেন প্রাণতা ফিরে আসে। এক অজানা দ্বীপের দলিত জীবনচক্রের ক্রান্তিকালের ধুম্রজালে দম আটকেপড়া আমরা এবার যেন নিশ্বাস নিতে পারলাম বুক ভরে। অবশেষে ২য় জ্যোৎস্নারাতের স্বাপ্নিক মৌরির ঘ্রাণমাখা শীতের ঘাসফুল ফেলে ইয়াক চালু করলাম আমরা মূল সাউথ আয়ল্যান্ড খ্রাইস্ট চার্চের দিকে। সূর্য ডোবার আগেই আকাশলীনা সুপ্তির মতো আমরা সুখের রঙিন মেঘ নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে এগুতে থাকি মূল ভূখন্ডে! যেখানে সুইটি আর ডালিয়ার বসতি কাম চিকিৎসা। আর আমাদের ঘরে ফেরার খ্রাইস্ট চার্চ বিমানবন্দর হয়ে সিঙ্গাপুর এবং সবশেষ ঢাকা!

==========

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অনেক যত্নে ঐ ডালটা নিয়ে এসেছিলাম বাংলাদেশে ফলসহ। একটা টবে লাগিয়েছিলামও দানা। কিন্তু প্রথমে ২/১টা বীজে কুঁড়ি ছাড়লেও, কদিন পর চারাগুলো মারা যায়, তাই ভেষজ চিকিৎসক হয়ে ওঠা আর হয়নি আমার। গাছটা বাঁচাতে পারলে হয়তো একজন খ্যতিমান ভেষজ চিকিৎসক হতাম আমি! কেবল ছবিটাই রেখেছি জীবনের এক স্মৃতি হিসেবে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমার ক্লাসমেট ভারতীর জন্যে মাঠে নামা

:

কৈশোরে আমার গাঁয়ের স্কুলে মুসলিম মেয়েরা বেশি পড়তোনা! তবে হিন্দু মেয়েরা প্রায় সবাই স্কুলে যেতো দল বেধে আমাদের সাথে। হোক তারা ধনী কিংবা দরিদ্র পরিবারের! আমার ৬-জন বালিকা ক্লাসমেটের মধ্যে ভারতী ধোপী ছিল পাশের ধোপা বাড়ির। বর্ষায় আমাদের সবার বাড়ির চারপাশে জল থৈ-থৈ করতো সমুদ্রের মত। তাই প্রায় ঘরেই রাতে হানা দিতো সাপ, সম্ভবত খাবারের খোঁজে। একবার ভারতীকে কামড়ালো বিষাক্ত এক সাপে। ভারতীর বাবা-ভাই ৩/৪ জন ওঝা ডেকে আনলো পাশের গাঁ থেকে। ওঝারা একক আর সম্মিলিতভাবে অনেক মন্ত্র আর "ডোর" দিলো কাঁচ ভাঙা দিয়ে হাত কেচে! কিন্তু ওঝার তুক-তাক মন্ত্রতন্ত্রে কোন কাজই হলোনা বিষের। মুখে সাদা ফেনা তুলে ভারতী নির্জিব হয়ে রইলো মরার মত। নিজ বোন রিনার মতই নিষ্প্রাণ ভারতীয় জন্য মন কাঁদলো আমার হু-হু করে।

:

কৈশোরে সোভিয়েত ভক্ত ছিলাম আমি! তাই প্রগতি প্রকাশন মস্কো থেকে পাঠানো একটা প্রাথমিক চিকিৎসার বই ছিল আমার কাছে। তাতে সাপে কাঁটার স্থানে পর পর ৩-টা বাঁধন দেয়ার পদ্ধতি ও ব্লেড দিয়ে ঐ স্থান চিঁড়ে তাতে গরম পানি ঢালার কথা বলা ছিল। সোভিয়েত বইর ছবির মত করে পরপর ৩-স্থানে শক্ত করে বাঁধলাম আমি ইলিশ জালের রশি দিয়ে! কিন্তু ব্লেড দিয়ে ওর হাত চিঁড়তে সাহস হলোনা কারো। ঐ বইতে 'এভিএস' বা 'এন্টিভেনম' ইঞ্জেকশনের কথাও লেখা ছিল কিন্তু আমাদের অন্ধকার গাঁয়ে ঐ ইঞ্জেকশন তখন কেন, এখনো পাওয়া যায়না।

:

ভারতীর কষ্ট দেখে স্বরতন্ত্রী কাঁপিয়ে, মুখ বাকিয়ে আর চোখের জল একাকার করে মেঘনাদ মহাকাব্যের রাবণপুত্র পরাজিত ইন্দ্রজিতের মত মাকে বললাম, 'মা! ভারতীতো তোমার কন্যাও হতে পারতো! ওর জন্য নৌকা বাইচের ছিপ নৌকার ব্যবস্থা করে দাও মা! ভারতীকে বাঁচাতে শহরে নেবো আমরা'! ছেলের চোখের জলে পরাজিত হয়ে মানবিক মা আমার ৫০-মাল্লাসহ ২৫০-টাকায় ভাড়াকরা ছিপ নৌকো তাৎক্ষণিক হাজির করলেন নদীর ঘাটে! একটা ঢেউটিনকে সমতল করে, তাতে ভারতীকে তুলে লম্বা ছিপ নৌকোর "রিভার এ্যাম্বুলেন্স" যখন অন্ধকার রাতে চলতে শুরু করলো ৫০-মাল্লার বৈঠার টানে, তখন তা গতিময় হলো যন্ত্রচালিত স্টিমারের চেয়েও বেশি। স্কুলের ঘন্টা দেয়ার বেলকে হাতে নিয়ে তালে-তালে আমি আর ভারতীর ছোটভাই 'হিরেণ' বাজাতে থাকলাম পুরো ৩০-মাইল পথ, যাতে প্রণোদনা পায় ৫০-মাল্লা এ উজান স্রোতে। বিরতিহীন ঠক-ঠক ঘন্টার শব্দে মাল্লাদের ঘামছোটা বৈঠার টানে প্রায় ৪-ঘন্টার মেঘনার আষাঢ়ী ঘুর্ণাবর্তের জলপথ শেষ করলাম আমরা মাত্র ১-ঘন্টায়। নদীর ঘাট ছিল সদর হাসপাতাল থেকে প্রায় ১-কি.মি দূরে। রাত ১২-টার দিকে ১০-মাঝির মাথায় টিনে শোয়া অচেতন ভারতীতে নিয়ে হাজির হলাম সদর হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে। সাথে ৫০-মাঝি!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

এক সাপে কাটা রোগির সাথে প্রায় ৬০-জন গ্রাম্য মানুষ, যাদের ৫০-জনের হাতেই বৈঠা আর মাথায় ফিতা বাঁধা দেখে ভয়ে ঘুম থেকে উঠে বসলো ইমারজেন্সি ডাক্তার আর নার্সরা। সোভিয়েত বইর কথার মতই 'এন্টিভেনম' ইঞ্জেকশন আনতে বললেন তারা বাইরের ফার্মেসি থেকে। মায়ের দেয়া টাকা থেকে ৯০০-টাকায় কিনলাম বর্ণিত ইঞ্জেকশন তখনকার সদর রোডের "ন্যাশনাল মেডিকো" নামক ফার্মেসি থেকে। হাসপাতালে পৌঁছার ৩০-মিনিটের মাথায় চিকিৎসা শুরু হলো ভারতীর। মধ্যরাতে ভারতীর মা বাবাসহ হিন্দুরা সবাই ভগবান শিবকে, আর মুসলিম মাঝিরা সবাই আল্লাহ নবীর নামে ভারতীয় প্রাণভিক্ষা চাইলো আকাশ আর নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে। আমি সোভিয়েত বইর নির্দেশনামত 'এন্টিভেনম' ইঞ্জেকশনের কার্যকারিতার জন্যে প্রতিক্ষা করতে থাকলাম পুরো রাত হাসপাতালের অন্ধকার করিডোরে। মৃত মৎস্যের জমাট হৃৎপিন্ডের মত উদ্বেলতা নিয়ে আমরা সবাই জেগে রইলাম সদর হাসপাতালের বারান্দায় সারারাত।

:

ভোর ৪-টার দিকে ভগবান শিব কিংবা আল্লাহ-নবী কিংবা এন্টিভেনমের কৃপায় সুখ-বাতাসের অনুসন্ধিৎসু চোখের চাহনি দিয়ে চোখ খুললো ভারতী। বারান্দায় ঘুমঘোরে জেগে থাকা সবাই তন্দ্রাহত সুখাতুর শালিক পাখির মত নেচে উঠলো মূহূর্তে। বিষক্রিয়া নষ্ট হলেও, আরো একদিন থাকতে বললো ডাক্তাররা ভারতীকে হাসপাতালে। কিন্তু গ্রামীণ ৫০-মাল্লা আর ভারতীর মা বাবার আগ্রহে আমরা ভোর ছটার দিকেই রোগীকে নিয়ে উঠলাম আবার সেই ছিপ নৌকোয়। ঘুমহীন রাতে ক্লান্ত সবাই মুরি আর গুড়ের বাতাসা দিয়ে "ব্রেকফাস্ট" করলাম নৌকোতেই, পাণীয় হিসেবে বর্ষাস্নাত নদীর ঘোলা জল বিনে পয়সায়।

:

আবার নৌকো ছুটলো গাঁয়ের পথে, এবার জীবনস্নাত ভারতীকে নিয়ে উৎসবের আনন্দে। ভরা ভাদ্রের পাকা তালের ঘ্রাণময়তার মৌ-মৌ গন্ধে সকাল ৮-টার দিকেই গাঁয়ের নদীর ঘাটে ভিড়লো আমাদের জীবনময়ী প্রাণজ নৌকো। পুরো গাঁর মানুষ ভীড় করলো নদীর ঘাটে মৃত ভারতীর লাশ নামাতে। কিন্তু যখন ৫০-মাল্লার শিহরিত হৃদ-কাঁপানো উল্লাসধ্বনির মাঝে ১০-মাঝির কাঁধে বসে হাস্যোজ্জ্বল ভারতী হাত নাড়লো এক অমোঘ দেবীরূপে, তখন যেন পৃথিবীর শাশ্বত সত্যের এক অমর মহাকাব্যিক লিপিকা তৈরি হলো ঐ সময় ঐ গাঁয়ের ঐ ঘাটের ঐ জলস্রোতে!

:

সমবেত হিন্দু নারীদের 'উলুধ্বনি' শেষ হওয়ার আগেই মুসলমান পুরুষরা 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনিতে সচকিত করলো মেঘনার নিটোল আনন্দময়ী জলবাতাসদের। প্রেমজ সমুদ্রবৎসল জলযানের মত ভিজে ভিজে মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম আমি - 'মা! মাগো! তোমার জন্যেই ভারতী বাঁচলো আজ'! চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে আভূমি নুয়ে পড়া প্রেমজ জীবন ছান্দিকতায় মা জড়িয়ে ধরলেন আমায়। আমার দলিতো স্কুল-বন্ধুর জীবনের কাছে ভালবাসার শারীরি ঋণ শোধ করে মাঠে নামলাম আমি। যে ধুলোমাঠ মা চিনিয়েছিল এক গ্রাম্য ছেলেকে একদিন! ঐ মাঠ চষা আর শেষ হয়নি কখনো আমার জীবন পথে। এখনো ভালবাসার অঙ্কুরহীন জীবনের বীজ বুনে যাই আমি সেই মাঠেই। যে মাঠে ঘুরতে শিখিয়েছিল আমার গায়ের দরিদ্র জলদাস জেলেরা, ভারতী আর আমার প্রাণদায়ী মা আমায় হাত ধরে-ধরে শ্রমঘন এক মৌমাছির মত এ বিশ্বে। এবং এক শ্রমিক মৌমাছি হয়ে এখনো সেই মাঠ চষে বেড়াচ্ছি, পুরো বিশ্বময় আমি! তাই বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিস্তিন কিংবা ইহুদি, সব মানুষের মৃত্যুতেই হৃদয় কেঁদে ওঠে আমার! এবং তাই চষে যাই এসব মানুষের জন্যে ভালবাসার কর্ষণহীন অনুর্বর ভূমির রূঢ় কৃষিজমি!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সাপে কাটা ভারতীর বিয়ে এবং পরবর্তী জীবন কথন
(আমার ক্লাসমেট ভারতীর জন্যে মাঠে নামার শেষ পর্ব)

:

ভারতী ধোপীকে সাপে কেটেছিল ৯ম শ্রেণিতে পড়ার সময়। ১০ম শ্রেণিতে উঠতেই হুগলির উত্তরপাড়ার কোতরং পৌর এলাকার বাসিন্দা সমীরণ দাসের সাথে বিয়ে হয় বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ভারতী ধোপীর। ভারতীর বাবা একটা লন্ড্রি চালাতো আমাদের গাঁয়ের বাজারে। কয়লা বা নারিকেলের মালার আগুন জ্বালিয়ে ইস্ত্রি গরম করে তারপর আয়রন করতো আমাদের গাঁয়ের ধনবান, শিক্ষক, চেয়ারম্যান এসব মানুষদের। আমরা কেবল পরীক্ষা বা বিয়ের কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগের দিনই ইস্ত্রি করাতাম জামা-প্যান্ট। তবে ভারতীর সাপে কাটা চিকিৎসার পর থেকেই ভারতীর বাবার অনুরোধে আমার বাড়ির সবার কাপড় বলতে গেলে বিনে পয়সার ধোলাই আর ইস্ত্রি করে দিতো সে। মা অনেকবার টাকা দিতে চাইলেও, সে টাকা নিতো না কোনদিন। যে কারণে বছরে ৪/৫ মন ধান দিয়ে দিতাম আমরা ভারতীর বাবাকে। আমাদের চুল কাটার নাপিতকে, বাজারের সামনের খেয়া মাঝিকেও বছরে ৩/৪ মন ধান দিতাম আমরা আগে থেকেই। এটাই আমাদের গ্রামের বেশ পুরণো রীতি ছিল। লন্ড্রিওয়ালাকে ধান দেয়ার রীতি আমার মা-ই প্রথম চালু করেন গাঁয়ে।

:

ভারতীর স্বামীর বাবা আমাদের গাঁয়ের নাপিত ছিল কিন্তু একাত্তরে যুদ্ধের সময় তারা শরণার্থী হয়ে ভারতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তাই স্বামী সমীরণের জন্ম ভারতের মাটিতেই। কিন্তু প্রাক্তন মাটির টানে আমার গাঁয়ের পরিচিত জ্ঞাতীর মেয়ে ভারতীকে বৌ করে নেয় সমীরণের বাবা। ভারতীর বিয়েতে আমার মা একটা অলঙ্কার, ২০-কেজি মহিষের দুধ, আর আমাদের পুকুরের অনেক মাছ দিয়েছিল ওর মা-বাবার অনুরোধে। আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে। হুগলি থেকে ৮-জন এসেছিল এ বিয়েতে কিন্তু কারুরই পাসপোর্ট ছিলনা, যারা রাতে আমাদের দোতলা ঘরে ঘুমুতো, ভারতীদের কুঁড়েঘর ছোট থাকার কারণে। বিয়ের পর ভারতীকেও তারা বিনে পাসপোর্টেই ভারতে নিয়ে যায় কিভাবে যেন জানিনা আমি।

:

প্রায় প্রতি বছর ভারতী বেড়াতে আসতো তার স্বামীকে নিয়ে আমাদের গাঁয়ে। বিশেষ করে জামাই ষষ্ঠীর ২/৪ দিন আগেই। প্রথম বছর একা, দ্বিতীয় বছর একটা বেবিসহ, ৪র্থ বছর দুটো বেবিসহ। ওর মেয়েদের নানাবিধ খেলনা আর চকোলেট কিনে দিয়েছিলাম আমি এক পুঁজোয়। আমার মা প্রতিবারই ভারতী, তার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন আমাদের ঘরে, সাথে ভারতীর মা-বাবাও থাকতো। একবার আমাদের মহিষের দুধের ঘন দধি নিয়ে গিয়েছিল কোলকাতাতে ভারতী তার স্বামীর বাড়ির জন্যে। হুগলিতে সেলুন ছিল ওর স্বামী সমীরণের। অনেকবার আমাদের বেড়াতে যেতে বলেছিল ভারতী আর তার স্বামী নিজ বাড়ি হুগলিতে। কিন্তু তখনো ভারত যাওয়া শুরু হয়নি আমাদের পরিবারের।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

৮ বছর আগে আমার মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর নিজ মায়ের আকুতিতে ভারতী একাই আসে তার ২-মেয়েকে নিয়ে আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে। আমার মায়ের জন্য শোক আর অশ্রু বিসর্জন করে ভারতী আপন মেয়ের মতই। বর্ষা ঋতুতে আমাদের দ্বীপগাঁ নিরাপদ নয় খুব নদী পারাপারে। ভারতীর কিছু জ্ঞাতিরা থাকতো মূল গাঁ থেকে বেশ দূরে নতুন জেগে ওঠা মেঘনার চরে। সেখানে সরকারিভাবে নির্মিত "গুচ্ছগ্রামে" ঘর পেয়েছিল তার কাকাতো ভাইবোনেরা। তাদের নিমন্ত্রণে ভারতী তার দু'মেয়েকে নিয়ে ঐ চরে বেড়াতে যাওয়ার পথে কালবোশেখি ঝড়ে পরে তাদের নৌকো। ৩০/৪০ জনের নৌকো ঝড়ের দাপটে উল্টে গেলে, তার নিচে পরে নৌকোর প্রায় সব যাত্রীরা। ৬/৭ জন পুরুষ সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও, সম্ভবত শাড়ী পরার কারণে ভারতী ডুবে যায় এবং তার কিশোরি ২-মেয়েও ডুবতে ডুবতে ভেসে যায় মেঘনার বর্ষার প্রচণ্ড ঢেউ আর স্রোতের মাঝে। অনেক ভাটিতে জেলেরা প্রবল স্রোত থেকে জীবিত উদ্ধার করে তাদের। খবর পেয়ে ভারতীর স্বজন আর এলাকার লোকজন কটা জেলে নৌকো নিয়ে চষে বেড়ায় পুরো মেঘনাল ঘোলা জল কিন্তু কারো কারো লাশ ১/২ কিমি ভাটিতে মিললেও, ভারতীর লাশ আর পাওয়া যায়না ঐদিন।

:

খেয়া ডোবার পরপরই আমার গাঁয়ের পুরণো বন্ধুরা মোবাইলে খবর দেয় আমায়। যে মৃত ভারতীকে কৈশোরে যমদূত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম আমি, সে আজ মারা যাবে তার চির পরিচিত মেঘনার জলে, তা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না আমি। সংবাদ পেয়ে ঢাকা থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় আমার গাঁয়ে পৌছে যাই ৬-ঘন্টার মধ্যেই। মনে দৃঢ়তা ছিল, অবশ্যই সে সাঁতরে উঠবে ভাটির কোন চরে, সে খবরের আকাঙ্খায় ক্ষণ গুণতে থাকি আমি। নিজে যোগ দেই আধুনিক "রেসকিউ বোট" নিয়ে জেলেদের দেশি ট্রলারের সাথে। বিদেশ থেকে আনা হাই পাওয়ার বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে থাকি পুরো মেঘনার এপার-ওপার। কিন্তু ২-দিন পর অনেক ভাটিতে চরফ্যাশানের কাছে মেঘনার শেষ সীমায় যেখানে মূলত সমুদ্র শুরু, সেখানে এক নারীর লাশ দেখি ভাসমান অবস্থায়। লাশ উল্টে গালের একটা কালচে চিহ্ন আর ঠোঁটের কাটা দাগ দেখে ভারতীকে চিনতে পারি আমি। স্পিডবোটে তুলে প্রবল ঝড়োবাতাসে ঢেউ আর উজান ঠেলে জেলে নৌকো বহরের সাথে আবার বোট ভেড়াই সেই পুরণো ঘাটে, যেখানে প্রায় কুড়ি বছর আগে ৫০-মাঝির আনন্দধ্বনির মাঝে কাঁধে চড়ে নেমেছিল ১৫-বছরের কিশোরি ভারতী। আজও নামলো সে কাঁধে চড়েই কিন্তু নিথর ফ্যাকাশে বিকৃত মুখ ভারতীর। আবার ঘাটে ভেঙে পড়ে গাঁয়ের মানুষ জীবিত ভারতীতে দেখবে এ আনন্দে।

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

আমি ভারতীকে বাঁচিয়েছিলাম একদিন, তাই গাঁয়ের সব মানুষেরা আমায় অগ্রাধিকার দেয় লাশ চিতায় তুলতে। স্ত্রী আর সন্তানের খবরে কোলকাতা থেকে ভারতীর স্বামী সমীরণ বিনে পাসপোর্টে বর্ডার পার হতে গিয়ে আটক হয় বিজিবির হাতে। প্রবল স্রোতধারার মেঘনার তীরেই সাজানো হয়েছে ভারতীর চিতা। ব্যথাতুর প্রেমতায় ছুঁয়ে দেয়া ভারতীর নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে, তার গালের নিটোল দাগটি সুষ্পষ্ট নজরে পড়ে আমার। যে মেয়েটিকে খুব কাছ থেকে প্রায় ১০-বছর দেখেছিলাম আমি। এ কম বয়সে এভাবে আমার প্রিয় সহপাঠীর চলে যাওয়া যেন জীবন ভাষার রক্তাক্ত এক পঙক্তিমালা হয়ে দাঁড়ায় আমার চোখের সামনে। ভারতীর অবয়ব এখন পুড়ে যাবে, এ চিন্তনে তার শারীরি শিল্পপাঠের পাটীগণিত বীজগণিত মেলাতে পারিনা আমি একটুও। চিতার দাউ-দাউ আগুনের দিকে তাকিয়ে চিনচিনে কষ্টের দীপাবলির উত্তরীয় হাতড়ে তাকিয়ে থাকি ভারতীর বৃদ্ধ মা-বাবা আর তার অবুঝ ২-কিশোরী কন্যার দিকে।

:

নিভে যাওয়া চিতার ছাইভস্ম মেঘনার জলে ভাসিয়ে স্নান করি আমরা সবাই ঐ ধাবমান স্রোতধারার মাঝেই। নদীতীরে দাঁড়ানো ভারতীর কন্যাদ্বয়ের কষ্টেভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে দু:খে প্লাবিত জীবনময়তার ঘর-গেরস্থালির কার্ণিশে ঝুলতে দেখি ছোটবেলার ভারতীকে। এক দলিত কষ্টের পাঁক হাত ধরাধরি করে আমার চারদিকে আকঁড়ে ধরে বুড়ো অক্টোপাসের মত। জগতের এ সুখহীন জীবনের নিষ্প্রদীপ মহড়ায় কেবল ভাবতে থাকি আমি, ভারতের পাসপোর্টহীন এ মা-হারা ২-শিশুকে কে মানুষ করবে বাংলাদেশে কিংবা কিভাবে পৌঁছাবো তাদের ভারতের মাটিতে? মানুষ, ভালবাসা, প্রাণতা, ঐশ্বর্য, কির্ত্তী আর অহমিকা সব একাকার করে, আমি ছেকে নিতে চাই ক্লান্ত বেদনার নির্যাস এ শিশুদের থেকে! তারপরো এক অভিমানী জ্যোৎস্নার ঘেরাটোপে বাঁধা জীবনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকি ভারতীর মেয়ে দুটোর দিকে, যারা কেঁদে মরছে দু:খাতুর রৌদ্রনীল আষাঢ়ী জ্যোৎস্নায় এক জলজীবনের অন্ধকার গাঁয়ে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ধর্মের পরীক্ষায় ডাঃ জাকির নায়েক এবং ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের মৃত্যু!

:

একদিন লাখো মানুষের সামনে ধর্মীয় বিতর্কে উপস্থিত হলেন ইসলাম ধর্মের পক্ষে যুক্তি নিয়ে ডাঃ জাকির নায়েক এবং খৃস্টান ধর্মের পক্ষে ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল।

:

বির্তকের এক পর্যায়ে ডাঃ জাকির নায়েক ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবলকে চ্যালেঞ্জ করলেন, "তিনি বাইবেলের মার্ক ১৬ অধ্যায়ের ১৭-১৮ উক্তি দু'টির পরীক্ষাটি দিতে পারবেন কি না"? বাইবেলের ঐ ২-উক্তিতে বলা আছে - "একজন যিশু বিশ্বাসি, যিশুর উপর বিশ্বাস করে যদি খুব মারাত্মক প্রাণঘাতী বিষপান করে, তবে বিষ তার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না"।

:

ড. ক্যাম্পবেল কিছুটা ভয় পেয়ে প্রসঙ্গ এড়াতে চাইলেন কিন্তু উপস্থিত লাখো মুসলমান চ্যালেঞ্জ ধরলেন এই বলে যে, "ক্যাম্পবেল যদি সত্যিই যিশুকে বিশ্বাস করেন, তাদের ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে তাকে এ পরীক্ষা দিতেই হবে"। মহা প্রবলেম দেখে আমতা আমতা করে অবশেষে ভয়ে ভয়ে রাজি হল ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। লাখো মুসলিম উল্লসিত হলেন এ ঘটনায়। সবার মুখে হাসি বিজয়ের। কেউ বিষ আনতে দৌঁড়ে গেলো বাজারে।

:

এবার বলা শুরু করলেন ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল।

- "হ্যাঁ, আমি বিষপান করবো কিন্তু সাথে সাথে ডাঃ নায়েককেও বিষের পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ ইসলামের সহীহ বুখারীর সহীহ হাদিসে নবী মুহম্মদ বলেছেন" - "কোন লোক যেদিন ৭-টি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোন রকম বিষ ও যাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা"। সূত্র দেখুন, বুখারী-৫০৪২, পৃ: ১৯৯, অনুচ্ছেদ : আজওয়া খেজুর, কিতাবুল আতমেয়া।

:

এবার মুখ কালো করলো মুসলিম জনপ্রিয় হিরো বিতার্কিক ডাঃ জাকির। কিন্তু লাখো মানুষের মাঝে যুক্তিবাদি হাজার দশেক লোক দাঁড়ালো নিরপেক্ষ সবার মাঝে। বললো,

- "হ্যাঁ ডাঃ জাকিরকেও এ পরীক্ষা দিতে হবে, যদি তিনি তাঁর নবীর কথা বিশ্বাস করেন"। কি আর করা, প্রবাদ আছে,"নমাজ চুরি করা যায়তো, সমাজ চুরি করা যায়না" অবশেষে শুকনো মুখে রাজি হলেন ডাঃ জাকিরও। এমন মুসিবতে পড়বেন, চিন্তাও করেননি তিনি!

:

লাখো মানুষের মাঝে বিশ্বের প্রায় সকল মিডিয়া উপস্থিত হলো এ ধর্মীয় পরীক্ষা দেখতে। ঠিক হলো, দুজনেই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে একই সাথে পরীক্ষা দেবে। ২-ধর্মীয় পুস্তক খুলে রাখা হলো সবার সামনে। ধর্মের পবিত্র বাণী অনুসারে বিষ খাওয়ানোর আগে ডাঃ জাকিরকে প্রথমে মদিনার ৭-টা আজওয়া খেজুর খাওয়ানো হলো 'প্রটেক্টর' হিসেবে। ড. ক্যাম্পবেলকে বলা হলো, যিশুর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর করতে। অবশেষে জীবনঘাতী Oxydoreductases বিষ দেয়া হলো দুজনকেই সমপরিমাণ। বিষ খাওয়ার আগেই ফ্যাকাশে মুখ দেখে বোঝা গেলো, ভয়ে তারা দুজনেই অর্ধমৃত প্রায়। দুজনেই ধর্ম নিয়ে নানাবিধ বাণিজ্যিক কথা বললেও, আসলে এসব কথা তারা বিশ্বাস করে, এটা তাদের চেহারায় পরিস্ফুট হলো না। তারপরো বিশ্ব মিডিয়ার সামনে সকলের চাপে কিংবা নিজ নিজ ধর্মের সম্মান রক্ষার্থে বিষ পান করলো তারা পবিত্র গড, আর মহান আল্লাহর নাম নিয়ে।

:

কিন্তু প্রাণঘাতী Oxydoreductases সময় নিলো না বেশি। মিনিটের মধ্যেই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলো দুজনেই। এবং এই ২-ধর্ম বিশারদ তাদের বিশ্বাসকে হার মানিয়ে মৃত্যুকে বরণ করলো। এ পরীক্ষার পর বন্ধ হলো ডাঃ জাকির নায়েক এবং ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের ধর্ম প্রতিযোগিতা! বিশ্বের মুক্ত মানুষ যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো!

[এটা একটা রূপক রচনা]

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

দ্রাবিড় জনপদের দলিত মানুষ!

:

হরপ্পার 'কিংসুক' নদীতটে পোড়া মাটির বাড়ি ছিল আমার! যাকে তোমরা এখন 'ইন্দুস ভেলি সভ্যতা' নামে ডাকো গর্ব করে। ওখানে কুমোরের কাজ করতো আমার পুরো পরিবার। ও সাম্যবাদী সভ্যতায় নারী-পুরুষ বিভাজন ছিলোনা আমাদের। বাড়ি সংলগ্ন সমতট ভূমিতে নিত্যপণ্যের কৃষি ছিল আমাদের ক্ষুদ্রাকারে। তাতে ধান, কুমড়ো, তরমুজ ফলাতাম আমরা আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক প্রয়োজনে! আমাদের নদীতটের মানুষগুলোর মাঝে কোন বিবাদ ছিলনা। তামাটে রঙের জেলে, তন্তুজ, কৃষাণ আর কুমোর-কামারগণ মিলেমিলে থাকতাম আমরা এ জলকেন্দ্রিক সভ্যতায়! জলপুজক ছিলাম আমরা! কারণ জলই আমাদের জীবন উপাদান। তাই জল ছাড়া অন্য কোন উপাসক ছিলনা আমাদের!

:

কিন্তু একদিন অশ্বারোহী ককেসীয় সেমেনিক সভ্যতার উজ্জ্বল বর্ণধারী কতিপয় মানুষ আকস্মিক আক্রমণ চালালো আমাদের জলকেন্দ্রিক নগরে। যুদ্ধ কি জানতাম না আমরা! কারণ কাউকে কখনো আক্রমণ করিনি আমরা। দখল করতে যাইনি কারো বসতি কিংবা জনপদ! নিজেদের পেশাতেই সুখী ছিলাম আমরা! তাই যুদ্ধাস্ত্র ছিলনা আমাদের। উজ্জ্বল বর্ণধারী বহিরাগত ককেসীয় মানুষগুলো ঘোড়ায় চলে এসেছিল নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। ওরা আমাদের সভ্যতাকে ধ্বংস করতে হত্যাযজ্ঞ চালালো দিনরাত! আকস্মিক এ আক্রমণে আমাদের দ্রাবিড় তামাটে পুরুষরা হতাহত হলো অগণিত। আমাদের শিশু আর নারীরাও এগিয়ে এলো আমাদের প্রাণ বাঁচাতে! কিন্তু কেবল পুরুষদের হত্যা করে নারী শিশুদের বাঁচিয়ে রাখলো ওরা হয়তো কৃতদাস বানাতে!

:

আমার মতো হাজারো কুমোর, কুষিজীবি আর জেলেরা পালাতে থাকলাম ক্রমাগত পূর্বদিকে। যেখানে তখনো আক্রমণ করেনি ককেসীয় সেমেটিকরা। আমার স্ত্রী, কন্যাদ্বয় আর শিশুসন্তান নিয়ে দৌঁড়ুতে থাকলাম আমরা জীবন বাঁচাতে। কিন্তু ককেসীয় আক্রমণকারীরা পিছু নিলো আমাদের। তাদের ঘোড়সওয়ারের সাথে অনেকেই পারলাম না আমরা! জীবন বাঁচাতে কেউ কেউ আত্মসমর্পন করলো তাদের কাছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের উপদলটি পরিবার-পরিজনসহ কেবল জীবনটা সাথী করে পৌঁছে গেলাম ভারতীয় তটের শেষ সীমায়। শেষতক কেলাকাড়াই হয়ে ধানুষকোদি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলাম আমরা নির্বিঘ্নে। অবশেষে মান্নার জলপথ সাঁতরে জনমানবহীন তপ্রোবান দ্বীপে বসতি গড়লাম আমরা। আমাদের কেউ কেউ এ দ্বীপকে সেরেনদীব নামেও ডাকতে থাকলো তখন। এখানে আবার আমরা জলকেন্দ্রিক ধীবর আর কৃষাণ সভ্যতা গড়ে তুললাম। এ সভ্যতার নতুন নাম আমরা রাখলাম 'সিংহল সভ্যতা'! শান্তিপ্রিয় ধীবর আর কৃষাণরা এখানেও যুদ্ধবিদ্যা তেমন রপ্ত করতে শিখলোনা। কারণ তারা মনে করেছিল এ দ্বীপে তারা থাকতে পারবে নির্বিঘ্নে! কিন্তু ততদিনে পুরো ভারতবর্ষ দখলে নিয়েছে আক্রমণকারী ককেসীয়রা। তারা তাদের ধর্ম, ভাষা আর শক্তি দেখাতে দেখাতে রামানাথপুরাম পর্যন্ত চলে এলো একদিন!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

ওরা খবর নিলো - দ্রাবিড় আমরা হরপ্পা সভ্যতা থেকে পালিয়ে সিংহল দ্বীপে গিয়ে আবার গড়ে তুলেছি এক শান্তির জনপদ। মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এ দ্বীপেও আক্রমণ করার দৃঢ় সংকল্প করলো তারা। কিন্তু তাদের অনেক সদস্যই যখন মান্নারের এ নীল জলপথ পাড়ি দিয়ে সিংহলে আক্রমণ চালাতে দ্বিমত পোষণ করলো, তখন তারা ছড়িয়ে দিলো - "সিংহলে বসবাস করছে এক 'রাক্ষস জাতি', দেবতা বিরোধী তারা, মানেনা বেদ-পুরাণ! যারা দেখতে তামাটে কুৎসিত। বেদের বাণী আর শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে তারা। তাই ধর্মের নামে ঐ রাক্ষস জাতিকে হত্যা করতে হবে আমাদের পূণ্যময় কাজ হিসেবে"! সপ্তপদী উপকথা তৈরি করে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দশরথের পুত্র রামের নেতৃত্বে আবার বেদবাহক ককেসীয়রা আক্রমণ করে আমাদের স্বর্ণময় দ্বীপ শ্রীলংকাকে। আক্রমণের আগে দ্রাবিড় জেলে আর কৃষিজীবি মানুষদের হত্যা করতে তারা রাজা দশরথ পুত্র-কামেষ্টী বা পুত্রেষ্টী যজ্ঞের আয়োজন করেন। যার প্রেক্ষিতে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়।এ চারজনই ছিলেন সেমেটিকদের কল্পনা নির্ভর ধর্মের বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। ককেসীয়দের ঋষি বিশ্বামিত্র দশরথের সভায় উপস্থিত হয়ে দ্রাবিড় তথা রাক্ষসদের ধ্বংস করতে রাজার সহায়তা প্রার্থনা করেন। তিনি এই কাজের জন্য ষোড়শ-বর্ষীয় রামকে নির্বাচন করেন। রামের সঙ্গে যান তার ছায়াসঙ্গী হিসেবে লক্ষ্মণ। রাম ও লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র বিশেষ শস্ত্রশিক্ষা ও নানান অলৌকিক অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেন আমাদের শায়েস্তা করতে।

:

আমাদের দ্রাবিড় রাজবংশীয় বিশ্রবা, নিকষা, পুলস্ত্য, কৈকসী, বীরবাহু, দশানন, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎসহ সকল নারী ও বীরগণকে 'রাক্ষস' নাম দিয়ে হত্যা করে ওরা পূণ্যময় কাজ বলে প্রচার করতে থাকে বিশ্বময়! আমাদের প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পার কিংসুক নদীতট থেকে পরাবাস্তব বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বর্ষাতি আষাঢ়ি ব্যঙের মতো পালাতে পালাতে এখনো ক্ষয়িষ্ণু জীবন ধরে রেখেছি আমরা! বৃষ্টিভেজা জলদ আষাঢ় এখনো মিছে মিছে গর্জায় আমাদের নীলাকাশে সাদা মেঘ হয়ে। আমাদের কষ্টপাথরের ধূসর নীলিমায় শুয়ে গর্ভিনী কালো মোষের মত জলে ডুবে থাকি এখনো আমরা এখানে ওখানে। তাই মেঘমুক্ত সাদাকালো নীলের কোলাজ মেঘের পদ্য লিখে যায় এখনো আমাদের কবিরা! ধূসর ঈশানের দিকে চেয়ে চেয়ে অবচেতনের আষাঢ়ী কদমের ঘ্রাণ নিতে নিতে এখনো বেয়ে চলেছি আমরা আমাদের পুরনো জীবন নৌকো! আমাদের শ্রান্তির জীবনে অলীক জলের শিহরণে কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে চলেছি আমরা এক বন্ধুর পথ ক্লান্তিহীনভাবে ! জানিনা কবে শেষ হবে আমাদের এ পথচলা! দ্রাবিড় মানুষের এ জীবন প্রবাহ যেন অনন্ত অসীম! যার পুরোধা ককেসীয় জনপদের সেমেটিক শুভ্রময় 'বেদধারী' এক সভ্য জাতি! যারা নিধন করেছিল আমাদের তন্তুজ আর ধীবর সভ্যতাকে! এবং এ প্রায় বিলুপ্ত জাতির শেষ ধ্বজা বহন করছি আমরা কতিপয় মানুষ দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা আর বাংলাদেশে! যার রক্তাভ কাহিনি কজন জানি আমরা! হয়তো জানি, হয়তা জানিনা!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

মুসায়লামার নবীত্ব ও এক তরুণ কবির কবিত্ব

:

ইয়াসরেবের তরুণ কবি আমি। আমার ডাকনাম 'বাশির'। পৈত্রিক নাম 'বাশির ইবনে হাকাম আল মারিদ'। ইয়ামামার 'বুতাহ' যাচ্ছি আমি। যে মরুদ্যানে বসবাস করে 'নাজদ' এর সবচেয়ে বড় ও নামকরা গোত্র 'বনু হানিফা'। প্রায় নব্বই হাজার মানুষের এ বসতিতে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় 'আরবি কবিতা উৎসব'। যাতে যোগ দিতে যাচ্ছি আসি ইয়াসরেব থেকে একাকি। শুনেছি কবিদের খুব সম্মান করা হয় ইয়ামামার বনু হানিফা গোত্রে। সুপাঠ্য কবিতা শোনাতে পারলে, ভাল উপঢৌকনও মেলে ঐ গোত্র প্রধান থেকে। উটে ৩-দিনের নিরাপদ যাত্রা শেষে, অবশেষে পৌঁছলাম কাঙ্ক্ষিত বনু হানিফা গোত্রে। ইয়াসরেবের বনু কুরাইজা গোত্রের জিউস কবি শুনে খুব সমাদর করলো তারা আমায়। অতিথিশালায় প্রবেশ করে অন্য এলাকা ও গোত্র থেকে আগত কবিদের সাথেও পরিচয় হলো আমার। লোহিত সাগরের কাছাকাছি 'বাক্কা' শহর থেকেও বেশ কজন কবি এসেছেন এ সম্মেলনে যোগ দিতে।

:

কবি ইবনুল কয়েস ও আরবি কবি গাসসানের কবিতা ছাড়াও নিজের রচিত তিনটি কবিতা আবৃত্তি করলাম আমি! এবং বিস্ময়করভাবে সকল প্রতিযোগিকে হারিয়ে কবি ও আবৃত্তিকার হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারলাম নিজেকে! দশ স্বর্ণমুদ্রা আর দশটি লোহিত উটে পুরস্কৃত হলাম আমি। আমি ইয়াসরেবের বনু কুরায়জা থেকে এসেছি ও একেশ্বরবাদী জিউস ধর্ম অনুসরণ করছি শুনে 'বনু হানিফা' গোত্রের কাছাকাছি 'আল-মাকলা' মরুদ্যানে বসবাসকারী জিউস বসতিতে নৈশভোজে আমন্ত্রিত হলাম আমি। বনু হানিফার সকল লোকজন আরবের 'হানিফাত খৃস্টান' হলেও, আল মাকলায় বসবাসকারী হাজার দুয়েক মানুষের সবাই ছিল জিউস ধর্মাবলম্বী। রাতে আহারের আগে জিউস বসতিপ্রধান 'হালিত বিন সাকালা'র ঘরে অনুষ্ঠিত হলো আমার নিজ ও প্রখ্যাত আরব কবিদের রচিত কবিতা পাঠ। কবিতা শুনে হালিত কন্যা 'আদামা বিনতে হালিত' প্রেমে পড়লো আমার। আল মাকলার জিউসদের রীতি অনুসারে সে সরাসরি পিতাকে বললো আমার প্রতি তার প্রেমাসক্তির কথা! এবং সুন্দরী হালিত কন্যা আদামাকে বিয়ে করে নতুন বউ সহ ইয়াসরেবের দিকে যাত্রা করলাম আমরা উপঢৌকন পাওয়া উট আর স্বর্ণমুদ্রাসহ।

:

বনু কুরায়জায় বেশীদিন ভাল লাগলোনা আমার। কারণ সেখানে কা'ব বিন আশরাফসহ অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে আমার কবিত্ব নিতান্তই ঠুনকো। তাছাড়া নিজ গোত্র বাদ দিয়ে ইয়ামামার অন্য গোত্র থেকে স্ত্রী নিয়ে আসাকে খুব একটা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি আমার পরিবার ও গোত্র। তাই স্ত্রী আদামাকে নিয়ে আবার একদিন যাত্রা করলাম ইয়ামামার আল মাকলার দিকে। যেখানে আদামার মা-বাবার বসতি। আমাকে আর আদামাকে সাদরে গ্রহণ করলো তারা। কবি হিসেবে আল-মাকলার জিউস বসতি ছাড়াও বনু হানিফা গোত্রেও ভীষণ সমাদৃত হলাম আমি। স্ত্রীর পরিবার থেকে প্রাপ্ত খেজুর বাগানের খেজুর খেয়ে, লোহিত উটের দুধ পান করে, দিনরাত কবিতা রচনা আর আবৃত্তি করে দিন ভালই চলছিল আমার। এর মাঝেই জন্ম নিলো আমার কন্যা 'আলোনা' এবং 'হান্নাহ'! আর পুত্র 'বেতজালিল' ও 'এলিজাহ'! ৪-সন্তান আর অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী আদামাকে নিয়ে এক চমকপ্রদ কাব্যিক সুখঘন জীবন ছিল আমাদের মাকলা মরুদ্যনে!

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে পরিবারের মুখোমুখি হই আমি। স্ত্রী আর সন্তানের চোখেমুখে রক্তাভ বেদনার অঙ্কুরিত কষ্টের দিনলিপি! কথা ছিল 'গাইবো তৃপ্তির গান খেজুরপাকা মরুদ্যানের শীতল জলে'! কিন্তু যুদ্ধ জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলায় মরতে মরতে যেন বেঁচে যাই আমরা কোনভাবে! অনাদিকালের বিষণ্ন উত্তারাধিকার থেকে বিভাজিত হয়ে এবার হাজারো লাশ ডিঙিয়ে আমরা এগুতে থাকি আমাদের আল মাকলা বসতির দিকে। ক্লেদমগ্ন রাতের তারার মৃয়মান রূপোলী জ্যোৎস্নার মতো হাত ধরাধরি করে হাঁটতে থাকি আমরা সামনে। মৃত জীবনের নিঃশেষ পরজিত জীবনের শেষসীমা দেখতে পাই অদূরে! দূরে শোনা যায় ক্ষীয়মান সুরে 'উপজাতীয় জীবনের তিমিরবিদারী অনুসূর্যের মর্সিয়া গান'! নতুন ধর্ম গ্রহণ করে সামনে এগুতে এগুতে পুরনো বসতির শুকনো কাঠে ঘুনপোকাদের বসতী ভাঙার গান শুনি এবার। পেছনের মৃত্যু উপত্যকা যেন মৃত্যুর তীব্র ঘ্রাণের মাঝে বিষাদের অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। মরুদ্যানের বাকহীন পশুপক্ষীরা করুণ বিতৃষ্ণায় মুখ তোলে চেয়ে থাকে আমাদের পথ চলার দিকে। আমি কবি মানুষ, তাই হৃদয়ে বাজতে থাকতে এমন কবিতা --

:

অনন্ত জীবন যদি পাই আমি তাহ'লে অনন্তকাল একা
পৃথিবীর পথে আমি ফিরি যদি দেখিবো সবুজ ঘাস ফুটে উঠে
দেখিবো হলুদ ঘাস ঝরে যায় দেখিবো আকাশ শাদা হয়ে উঠে ভোরে-
ছেঁড়া মুনিয়ার মত রাঙা রক্ত—রেখা লেগে থাকে বুকে
তার সন্ধ্যায়—বারবার নক্ষত্রের দেখা পাবো আমি;
দেখিবো অচেনা নারী আলগা খোঁপার ফাঁস খুলে ফেলে চলে যায়
মুখে তার নাই আহা গোধূলির নরম আভাস।

অনন্ত জীবন যদি পাই আমি—তাহ'লে অসীমকাল একা
পৃথিবীর পথে যদি ফিরি আমি—ট্রাম বাস ধুলো দেখিবো অনেক আমি—
দেখিবো অনেকগুলো বস্তি, হাট—এঁদো গলি, ভাঙ্গা কলকী হাড়ী
মারামারি, গালাগালি, ট্যারা চোখ, পচা চিংড়ি—কত কি দেখিব নাহি লেখা
তবুও তোমার সাথে অনন্তকালেও আর হবে নাকো' দেখা।

[নোট : এটি কোন ইতিহাস নয়, ইতিহাস আশ্রিত 'গল্প' মাত্র]

সত্যের সন্ধানে
shottershondhane.com

সৌদি আরব শিরোচ্ছেদ ও অন্যান্য

জাহাঙ্গীর হোসেন

shottershondhane.com